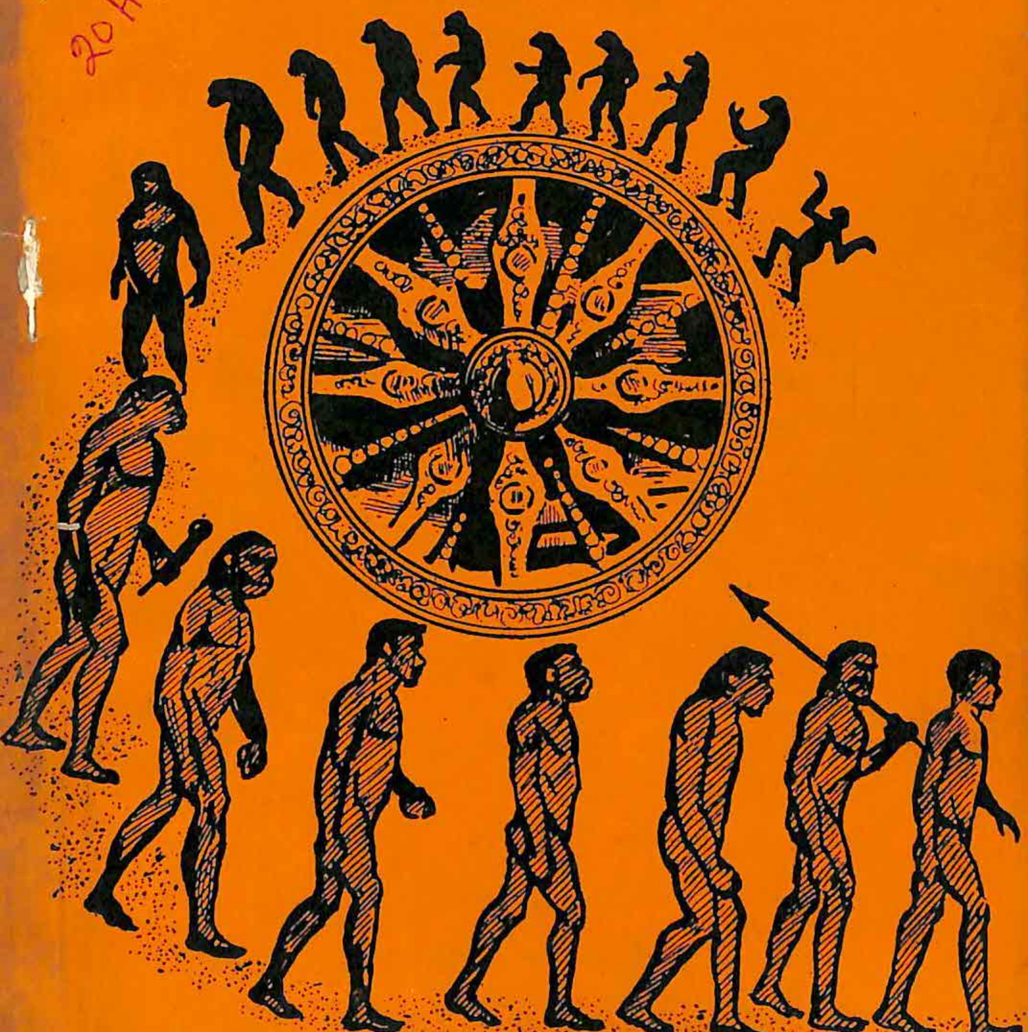
মানব-সভ্যতার ইতিহাস

(প্রাচীন যুগ)



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education
as a text book for Class VI, Vide Notification
No. T. B. VI/H/79/84, dated 5.12.79.

মানব-সভ্যতার ইতিহাস

(প্রাচীন যুগ)

● ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ●

ডক্টর কালীপদ হোড় এম. এ., পি.-এইচ. ডি.
ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, রাণাঘাট গভঃ স্পনসর্ড কলেজ
এবং, পরীক্ষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা-ভারতী
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education
as a text book for Class VI, Vide Notification
No. T. B. VI/H/79/84, dated 5.12.79.

মানব-সভ্যতার ইতিহাস

(প্রাচীন যুগ)

● ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ●

ডক্টর কালীপদ হোড় এম. এ., পি.-এইচ. ডি.
ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, রাণাঘাট গভঃ স্পনসর্ড কলেজ
এবং, পরীক্ষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা-ভারতী
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীভবেশচন্দ্র বিশ্বাস
৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—মার্চ ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৮১

[ভারত সরকার প্রদত্ত স্বল্প মূল্যের কাগজ দ্বারা তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত।

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীবিভাস কুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবী, প্রাণী, মানুষ

সূর্যের চারিদিকে যে গ্রহগুলি অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে, আমাদের পৃথিবী তাদেরই একটি। সাতটি মহাদেশ, পাঁচটি মহাসাগর এবং অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে তৈরী আমাদের এই পৃথিবী। এখানকার গাছপালা ও প্রাণীর সংখ্যা সঠিকভাবে গুণে বলা প্রায় অসম্ভব। আজ থেকে ছ'শ কোটি বছর আগে (কোন কোন পণ্ডিতের মতে চারশ' ষাট কোটি বছর আগে), পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। পৃথিবীর জন্ম কিভাবে হল সে বিষয়ে অবশ্য নানা পণ্ডিতের নানা মত। তবে বেশির ভাগ পণ্ডিতই এখন মনে করেন যে, খুব জমাট একতাল বস্তু হঠাৎ ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ফলেই নক্ষত্র, গ্রহ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। তোমরা নিশ্চয়ই জান, আমাদের সূর্য এমনি এক নক্ষত্র। আর পৃথিবী যে সূর্যের একটি গ্রহ সে-ত আগেই বলেছি।

আমাদের মনে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, এই পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হল কি করে? যতদূর জানা গেছে, আজ থেকে প্রায় দু'শ ষাট কোটি বছর আগে পৃথিবীর জল-কাদায় প্রথম শ্যাওলা জাতীয় জিনিস দেখা যায়। আর মেরুদণ্ডহীন একরকম প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে প্রায় ষাট কোটি বছর আগে, সমুদ্র অঞ্চলে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই প্রাণীর একটি শাখাই শেষ পর্যন্ত মানুষে পরিণত হয়। এই মানুষ পৃথিবীর সর্বশেষ সন্তান। সে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠও বটে। এসো, আজ এই মানুষের ইতিহাসই তোমাদের বলি।

প্রথম প্রথম আদিম মানুষ পশুর মতই চার পায়ে চলত। পরে সে ধীরে ধীরে গেরিলা, ওরাং-উটাং ও শিম্পাঞ্জীর মত দাঁড়াতে শিখল দু'পায়ের ওপর ভর করে। এদের সঙ্গে তাদের মিল ছিল খুব। তখনও সে চলত কুঁজো হয়ে। শেষ পর্যন্ত সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখল, তার মগজ বা মস্তিষ্ক উন্নত হল, সে হাত দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বা হাতিয়ার বানিয়ে ফেলল এবং এই

হাতিয়ার দিয়ে শুধু পশুপাখীর আক্রমণ থেকেই নিজেকে রক্ষা করল না, শিকারও করতে লাগল ছোটবড় নানা রকমের পশু-পাখী। হাতের সাহায্যে সে খুঁজে পেতে নিয়ে এল কত ফলমূল আর শাক-সব্‌জী। আগে সে অঙ্গভঙ্গী করে মনের ভাব প্রকাশ করত। পরে তার মুখে কথা ফুটল, সৃষ্টি হল ভাষার। এইভাবে মানুষ পশু থেকে পৃথক হয়ে গেল। পশু তো হাতিয়ার বানাতে পারে না। কথা বলার, ভাষা তৈরী করার ক্ষমতা থেকেও সে বঞ্চিত।



আদিম মানুষের হাতিয়ার

বিশাল চেহারার ম্যামথ বা হাতী, খাঁড়ার মত দাঁতওয়ালা বাঘ, হায়েনা, ঝড়-বৃষ্টি, শীত-তাপ, বন্যা, ভূমিকম্প, খাদ্যের অভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে দুর্বল, অসহায় মানুষ বেঁচে থাকল প্রধানতঃ তিনটি জিনিসকে সম্বল করে—(১) বুদ্ধি, (২) হাত ও হাতিয়ার, (৩) একতা বা দলবদ্ধ হয়ে চলা।

মানুষ ধীরে ধীরে আগুনের ব্যবহার শিখল। চাষবাস ও পশুপালন শুরু করে সে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরী করে নিল। তারপর মানুষ চাকা গড়ল, কাঁচা ও পাকা বাড়ী বানাল পাথরে ও গুহার দেয়ালে চমৎকার সব ছবি আঁকল, নানা দেবদেবীর কল্পনা করল, এমনি আরও কত কি!

এইভাবে বহু লক্ষ বছরের চেষ্টার ফলে আদিম বন্য মানুষ যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে একসঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করতে লাগল, অর্থাৎ সভ্য হল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে মানুষ বিচিত্র ধরনের কত সভ্যতা গড়ে তুলেছে। এই সভ্যতাগুলিকেই একসঙ্গে মানব-সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের কয়েকটি দেশের এই সভ্যতাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন যুগের মানবসভ্যতা সম্বন্ধে জানতে হলে মানুষের ইতিহাস জানা দরকার। মানুষের অতীত জীবন, তার কীর্তি ও ব্যর্থতার কাহিনীই **ইতিহাস**।

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা—পৃথিবীর সব দেশের স্কুল-কলেজেই ইতিহাস পড়ান হয়ে থাকে। কিন্তু কেন, বল ত? সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া যাক।

আমরা আমাদের জীবনের অতীত ঘটনা, পরিবারের বা বংশের বহু জীবিত বা মৃত লোকের নাম ও কীর্তিকাহিনী মনে করে রাখি। একে বলা হয় স্মৃতি। মানবজাতির স্মৃতি হল ইতিহাস। যে স্মৃতিভ্রষ্ট অর্থাৎ কিছু মনে করতে পারে না, তাকে সুস্থ মানুষ বলা যায় না। সুতরাং সুস্থ, সভ্য মানুষকে তার অতীত কাহিনী বা ইতিহাস মনে রাখতেই হবে। সব কিছু মনে রাখা যায় না বলেই পুঁথি-পুস্তকে তা লিখে রাখা হয়। এগুলিকে বলে ইতিহাস গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করেই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী, তাদের গড়া নানা সভ্যতার ইতিকথা জানতে পারি, তাদের দুঃখে কাঁদি, আনন্দে পুলকিত হই।

হাঁটার সময় এক পা পিছনে রেখে অন্য পা এগিয়ে দিতে হয়। মানব জাতির এগিয়ে চলার পথেও তার অতীত জীবন, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে। আমাদের বর্তমান জীবনের অনেক কিছুই ভাল করে বুঝতে হলে অতীত কাহিনী জানা দরকার। কোন একটি জাতি যে পথে চলেছে, ভবিষ্যতেও তার প্রায় সেই ধরনের পথেই চলার সম্ভাবনা বেশী। ইতিহাস পড়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী জেনে আমরা শুধু আনন্দই পাই না, যথেষ্ট লাভবানও হই। তাদের ব্যর্থতা আমাদের সাবধান করে। তাদের জয় আমাদের উৎসাহ যোগায়। শুধু তা-ই নয়। প্রাচীন মানুষের বিভিন্ন আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই আমরা নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছি।

কত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে, কত অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কত পরিশ্রম করে: মানুষ এগিয়ে চলেছে। সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে আজ সে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে চলেছে—এ কাহিনী না জানলে আমাদের শিক্ষা বা জ্ঞান কখনও পরিপূর্ণ হতে পারে না।

ইতিহাস থেকেই জানা যায়, মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির দানে; মানবসভ্যতা কোন বিশেষ জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।

ইতিহাসের উপাদান—যে সকল প্রমাণ বা তথ্য থেকে মানুষের অতীত দিনের কথা জানা যায় তাদের বলে ইতিহাসের উপাদান বা উপকরণ। প্রত্নতত্ত্ব, চিত্র, লিপি, পুঁথি ও মুদ্রা মানুষের ইতিহাসের প্রধান উপাদান।

আদিম যুগের মানুষ প্রথম দিকে প্রায় বোবাই ছিল বলা যায়। পরের দিকে সামান্য কথা বলতে শিখলেও সে কিন্তু কিছুই লিখতে পারত না। সুতরাং তার লেখা কোন পুঁথি বা বই পাওয়া যায়নি। বন্য আদিম মানুষের বাসস্থান গুহা ইত্যাদি খুঁড়ে, নদীর খাতের মাটি সরিয়ে, তার কবরখানা উল্টে পাল্টে বেশ কিছু হাড়গোড়, মাথার খুলি, হাতিয়ার, ছাই প্রভৃতি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা অনেক মাথা খাটিয়ে বার করেছেন, কোনটা মানুষের হাড়, কোনটা পশুর, হাতিয়ারগুলিই বা কোন্ যুগের এবং সেগুলি কোন্ কাজে লাগত।

১। **প্রত্নতত্ত্ব**—মাটি খুঁড়ে প্রাচীন মানুষের চিহ্ন বা নিদর্শন খুঁজে বার করার বিদ্যাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে আবিষ্কার করা তথ্য বা উপাদান ইতিহাসের একটি প্রধান উপকরণ। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে শুধু মানুষের হাড়গোড় ও হাতিয়ারই পাওয়া যায়নি। তার গড়া সভ্যতার, গ্রাম ও নগরের মূল্যবান নিদর্শনও পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে।

২। **চিত্র**—আদিম মানুষ গুহার দেয়ালে মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির বহু চিত্র বা ছবি এঁকে বা খোদাই করে রেখে গেছে। তার হাতিয়ারের গায়ে, পাথরে, মাটির চাক্তি ও পাত্রেও এরকম বহু ছবি দেখা যায়। এগুলি থেকে মানুষের জীবনযাত্রা, শিল্পপ্রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা গেছে।

৩। **লিপি**—মনুষ বহুদিনের চেষ্টার পর লেখার কায়দা-কানুনও আয়ত্ত করে ফেলে। পাথরে, মাটির চাক্তিতে, তামার পাতে, বাড়ীঘর বা মন্দিরের গায়ে, গুহার দেয়ালে, পাথরের স্তম্ভে, তার লেখা পাওরা গেছে। চামড়ায়, গাছের ছালে (ভূর্জপত্র), তালপাতা প্রভৃতিতেও লেখা চলতে থাকল। বলা বাহুল্য, এই লেখা বা লিপি থেকে মানুষের অতীত কাহিনী বহু পরিমাণে জানা গেছে।

৪। পুঁথি—লিখন রীতি আবিষ্কারের কিছু পরেই মানুষ নানা বিষয়ে পুঁথি বা বই লিখতে লাগল। অবশ্য এই বইগুলি ছিল হাতে-লেখা। ছাপাবার উপায়ও তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। শীঘ্রই শুরু হল মানুষের ইতিহাস লেখা। এ থেকে তখনকার অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছি। এই সময় থেকেই সুরু হয় **ঐতিহাসিক যুগ**। এখানে বলে রাখা ভাল, আগের যুগকে বলা হয় **প্রাগৈতিহাসিক যুগ**।

৫। মুদ্রা –সভ্য মানুষ লেনদেন বা ব্যবসা-মাণিজ্যের সুবিধার জন্য মুদ্রার প্রচলন করে। কড়ি ধাতুর টুকরো ইত্যাদি মুদ্রা বা টাকাপয়সা হিসাবে ব্যবহার করা হতে লাগল। ধাতুর ফলক বা মুদ্রায় শাসক বা রাজা-মহারাজার নাম, তারিখ, ছবি প্রভৃতি থাকায় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা গেছে। এইসকল উপাদান ব্যবহার করেই প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদ্যি কালের মানুষ

কোন্ সুদূর অতীতে বানর জাতীয় এক প্রকার জীব থেকে মানুষের উৎপত্তি ঘটেছিল তা বলা সহজ নয়। তবে এটা ঠিক যে, ক্রমবিবর্তনের ফলেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছে।

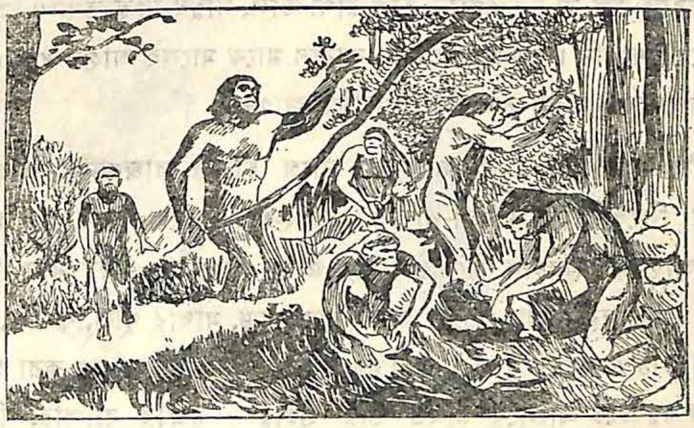
পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, আজ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ বছর আগে মানুষ জাতীয় প্রাণী পৃথিবীতে চোখ মেলে। এ যুগের মানুষ ছিল



আদিম মানুষ (পিকিং মানব)

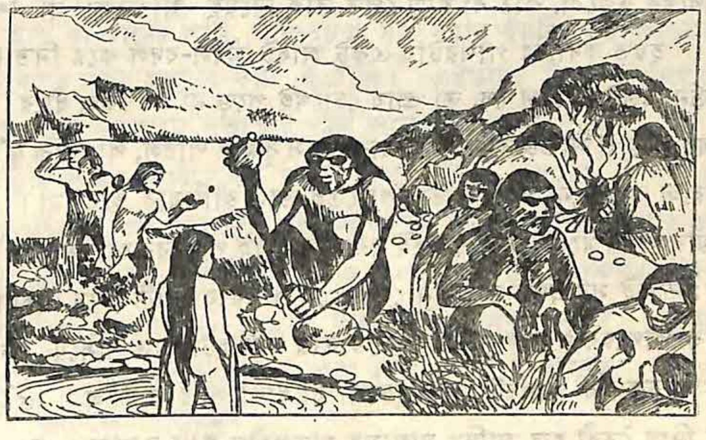
খাদ্যসংগ্রহকারী। সে পশুপাখী শিকার করে তাদের কাঁচা মাংস খেত। বন-জঙ্গল থেকে বুনো ফলমূল ও নদ-নদী, সমুদ্র থেকে মাছ ধরেও সে ক্ষুধা মেটাতে জানত। সে তখন নিজের খাদ্য নিজে তৈরী করতে শেখেনি।

আন্দাজ পাঁচলক্ষ বছর আগে এই মানুষ আরও উন্নত হয় এবং **আগুনের** ব্যবহার শিখে নেয়। আগুনের ব্যবহার শেখার ফলে মানুষের জীবনধারায়



খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষ

বিরাট পরিবর্তন আসে। সে এখন থেকে কাঁচা মাংস ঝলসিয়ে খেতে শেখে। এ থেকেই পরে রান্নাবান্নার চলন হয়।



হাতিয়ার বানানো ও আগুনের ব্যবহার

গুহার মুখে আগুন জ্বেলে মানুষ শুধু হিংস্র পশুই তাড়াত না, রাতের ঘন অন্ধকারও সে দূর করতে সমর্থ হল। শীত ও বর্ষার সময় শরীর গরম করারও

আর কোন অসুবিধা রইল না। আগুনের ভয়ে পশুর দল গুহামুখো না হওয়ায় মানুষ নিশ্চিন্তে সেখানে বসবাস করতে লাগল, বারবার এ গুহা ও গুহা করতে হল না। এখানে বলে রাখা ভাল, মানুষ কিন্তু তখনও আগুন জ্বালাতে শেখেনি। বন-জঙ্গলে নানা কারণে মাঝে মাঝেই আগুন ধরে যেত। সেখান থেকেই মানুষ সংগ্রহ করে আনত আগুন।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন লক্ষ বছর আগে চীনের রাজধানী পিকিং-এর পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এক গুহায় একদল মানুষ বাস করত। তারা আগুনের ব্যবহার শিখেছিল বলে জানা গেছে। এদের নাম **পিকিং মানব**। এদের গুহা খুঁড়ে প্রচুর হাড়গোড়, মাথার খুলি, কঙ্কাল, ছাই, পোড়া কাঠ ও ফলের বীজ পাওয়া গেছে। পিকিং মানব সংগ্রহ-করা আগুন অত্যন্ত যত্ন করে জ্বালিয়ে রাখত তার গুহায়। মজার ব্যাপার, পিকিং মানবের অনেক আগে যারা প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল সেই মানুষ-দেরও বসতি ছিল ঐ একই গুহায়। গুহাটির নাম 'শোকোতিয়েন'।

পুরাতন প্রস্তর যুগ—অতি প্রাচীনকালে মানুষ হাতের কাছে যে প্রস্তর বা পাথরের টুকরো, কাঠ বা হাড় পেত তাই দিয়েই আত্মরক্ষা বা শিকার করত। হয়ত কদাচিৎ পাথরটার একটু আধটু অদল-বদল করে নিত। এ পরিবর্তন এতই সামান্য যে, তা প্রায় চোখেই পড়ে না। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকায় সে বুঝতে পারল, পাথরকে ছুঁচলো বা ধারাল করতে না পারলে তা কিছুতেই ভাল হাতিয়ার হবে না। তার হাতিয়ারগুলির মধ্যে তখন পাথরই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই পাথরের হাতিয়ারকে উন্নত করার দিকেই সর্বপ্রথম তার মন গেল। সে পাথর বা লাঠি নিয়ে একটা শক্ত চকমকি পাথরের খণ্ডকে ঠুকতে ঠুকতে তার কয়েকটা পাত খসিয়ে ফেলল। এর ফলে চকমকি পাথরটা বেশ ছুচলো বা ধারালো হয়ে উঠল। এইরকম পাথর দিয়ে তৈরী হল আদিম মানুষের হাতলহীন **হাত-কুড়াল**। এই কুড়াল দিয়ে মানুষ শিকার করত, কাঠ কাটত, হাড় ভাঙত, মাটি খুড়ে শেকড়বাকড়, আলু প্রভৃতি বার করত। ধারাল পাথরের টুকরোয় তৈরী হত **কাটারি**। চ্যাপটামত এবড়ো-খেবড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে বানানো হল **চাঁছার যন্ত্র**।

এটি দিয়ে পশুর চামড়া ছাড়ান যেত। ছুঁচলো পাথরের টুকরো দিয়ে বর্শার ফলা বানিয়ে সহজেই জন্তু-জানোয়ার ঘায়েল করা হতে লাগল। পাথরের পাত থেকে তৈরী হল ছুরি। পাথরের পাত খসানোর জন্য হাড়ের বা কাঠের



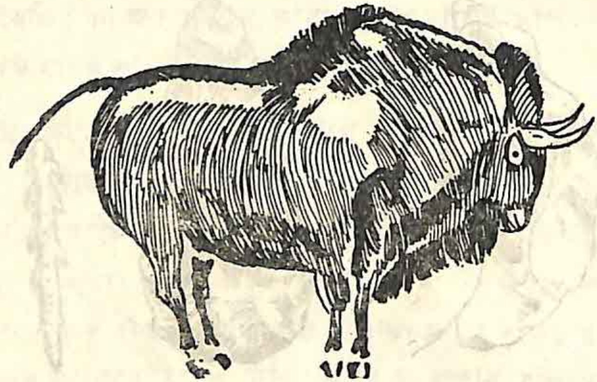
পুরাতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ার : ১. কাটারি ২. হাতকুড়াল ৩. হারপুন

বাটালি তৈরী করতেও বেশীদিন লাগল না। চকমকি পাথরের সরু লম্বা পাত থেকে খোদাই বা চেরাই করার যন্ত্রও তৈরী হয়ে গেল। তারপর একে একে বানানো হল শিঙ বা হাড়ের কাঁটাযুক্ত বর্শা, হাতুড়ি, পাথরের টুকরোর দাঁত বসানো হাড় বা কাঠের লাঠি, তীর-ধনুক, মাছ ধরার বঁড়শি, ছুঁচ, জানোয়ার বা পাখী ধরার নানা ধরনের ফাঁদ ইত্যাদি। এইভাবে উন্নত হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ একলাফে সভ্যতার পথে অনেকদূর এগিয়ে গেল।

যে যুগে প্রস্তর বা পাথরের পাত তুলে ফেলে ছুঁচলো ও ধারালো হাতিয়ার বানানো হত তার নাম পুরাতন প্রস্তর যুগ। এ যুগ পৃথিবীর প্রায় সব কটি মহাদেশে দীর্ঘকাল ধরে বর্তমান ছিল। এ যুগ আন্দাজ খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচলক্ষ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব আট হাজার অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরাতন প্রস্তরযুগকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়—(১) পুরা প্রস্তরযুগ, (২) মধ্য প্রস্তরযুগ, (৩) নব্য প্রস্তরযুগ।

পুরাতন প্রস্তরযুগের আরো কয়েকটি কীর্তির কথা মনে রেখো। এই যুগের মানুষ সেলাই করা চামড়া ও লোমের পোশাক পরত, গুহার দেয়ালে এঁকে রাখত রঙ-বেরঙের সুন্দর সুন্দর চিত্র, এমনকি বেশ কিছু কথা বলতেও

শিখেছিল তারা। বরফের উপর দিয়ে টেনে নেওয়া যায় এমন গাড়ী, যাকে বলে শ্লেজ তা-ও এ যুগেরই আবিষ্কার। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল আগুনকে মানুষের ব্যবহারে লাগান। একে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা হয়ে থাকে।



পুরাতন প্রস্তর যুগের গুহা চিত্র

নব্য প্রস্তরযুগ—নব্য বা নূতন প্রস্তরযুগে মানুষ তার হাতিয়ারকে আরও উন্নত করতে সমর্থ হল। এবার সে পাথরের টুকরোকে শানপাথরে ঘষে মেজে ধারালো বা ছুঁচলো করে তুলল। এই হাতিয়ারের ধার সহজে



নব্য প্রস্তর যুগের নানা হাতিয়ার

নষ্ট হত না। এটির পরত বা পাত তোলা হত না বলে টেকসইও হত খুব বেশী। এ যুগে হাতকুড়াল ও বর্শার ফলা দিয়ে শিকার করতে তাই

খুবই সুবিধা হয়েছিল। এই কুড়াল দিয়ে বহু গাছ কাটাও সম্ভবপর হয়। শীঘ্রই এই কুড়ালে লাগান হল কাঠ বা শিঙের হাতল। মানুষ কিছুদিনের মধ্যেই এর সাহায্যে তৈরী করে ফেলল লাঙল, চাকা আর নৌকা। শুরু হল কৃষি আর ব্যবসা-বাণিজ্য।

নব্য প্রস্তরযুগ আন্দাজ খ্রীষ্টপূর্ব আট হাজার অব্দে শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর সমাপ্তি ঘটে আঠারশ' খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনও এই যুগের রেশ চলছে। প্রধানতঃ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই যুগের বহু চিহ্ন পাওয়া গেছে।

নব্য প্রস্তরযুগে মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে অনেকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেলেছিল। ফলে এ যুগে এক মহাবিপ্লব ঘটে যায়। এ যুগের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : (১) কৃষি, (২) পশুপালন, (৩) স্থায়ীভাবে বসবাস, (৪) বাড়ীঘর নির্মাণ, (৫) সমাজে বসবাস বা গোষ্ঠী জীবনের সূত্রপাত, (৬) চাকা তৈরী করা, (৭) চাকার সাহায্যে মাটির পাত্র বানানো, (৮) কাপড় বোনা, (৯) ভাষার আবিষ্কার, (১০) ধর্মীয় বিশ্বাসের সূচনা, (১১) শিল্পের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি।

কৃষি—নূতন প্রস্তরযুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে এক লাফে খাদ্য উৎপাদনকারীতে পরিণত হয়। ফলের আঁটি, ঘাসের দানা থেকে কিভাবে চারা হয়, ফল বা দানা ফলে ওতে,—তা দেখেই মানুষ কৃষি বা চাষ করতে শিখেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে বন জঙ্গল পরিষ্কার করে বীজ ছড়িয়ে দেয়। আর একটু অভিজ্ঞতা বাড়লে সে লাঙল দিয়ে জমি খুঁড়ে নিতে থাকে। শীঘ্রই জমি খোঁড়ার জন্য তৈরী হল কাঠ বা পাথরের কোদাল এবং লাঙল। শিঙের তৈরী লাঙলও ছিল তখন। ফসল কাটার জন্য বানান হল ছুঁচলো নুড়ি বসান বাঁকা পাথর বা হাড়ের কাস্তে। দেখতে দেখতে এসে গেল হামান দিস্তা, শিলনোড়া আরও কত কি। অনেকের ধারণা, চাষবাসের ব্যাপারটা নাকি মেয়েরাই প্রথম শুরু করেছিল।

পশুপালন—এই যুগে মানুষ বহু বুনো পশু যেমন, কুকুর, গরু, ভেড়া, শূয়োর প্রভৃতিকে পোষ মানাতে শেখে। এইসব পশুর অনেক বাচ্চা হওয়ায় দুধ ও মাংসের কোন অভাব রইল না। ঘরে শস্য, মাংস ও দুধ সর্বদাই

মজুত থাকায় মানুষকে আর খাদ্যের সন্ধানে অনবরত এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে হল না। মানুষ পোষা পশুকে মাল বওয়া ও গাড়ী টানার কাজে লাগিয়েও যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল।

গোষ্ঠী জীবন—কৃষির প্রচলন হওয়ায় মানুষকে সারা বছর ধরে জমির কাজেই ব্যস্ত থাকতে হত। তাই সে স্থায়ীভাবে জমির কাছাকাছি বসবাস করতে বাধ্য হল। এর ফলে অনেকগুলি চাষী পরিবার একই জায়গায় পাশাপাশি বাস করতে থাকে। কারণ জমি পরিষ্কার, লাঙল দেয়া, আগাছা বাছাই, জলসেচ, ফসল রক্ষা, ঝাড়াই-মাড়াই প্রভৃতি কাজ একা করা যায় না। বন্যা ও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও একসঙ্গে থাকা ও কাজ করা খুবই জরুরী ছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে গোষ্ঠী বা যৌথ জীবন যাপন শুরু হল। গড়ে উঠল গ্রাম, নগর, সমাজ ও রাষ্ট্র।

বাড়ীঘর—মানুষ প্রথম দিকে গাছের খুঁটি, নলখাগড়া, ঘাস-পাতা ও মাটি দিয়ে কাঁচা বাড়ী তৈরী করত। পরে অবশ্য সে পাথরের পাকা বাড়ী তৈরী করতে শেখে। এগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য মানুষ চারিদিকে পাথরের পাঁচিল তুলে দেয় এবং গভীর পরিখা বা খাত কাটে। এ যুগের লোক হ্রদের জলে খুঁটি পুঁতে তার ওপর ঘরবাড়ী তৈরী করতে বলেও জানা গেছে।

যানবাহন—নব্য প্রস্তরযুগে চক্র বা চাকা নির্মাণ ও তক্তা জুড়ে নৌকা তৈরী শুরু হওয়ায় যানবাহনের বিরাট উন্নতি সাধিত হয়। শীঘ্রই নানা ধরণের চাকাওলা গাড়ী, পোষা পশুরা টানতে থাকে। চাকা থাকায় গাড়ীর গতি অনেক বেড়ে যায়। নৌকা ও পালতোলা জাহাজে করে জলপথে দ্রুত যাতায়াতেরও ব্যবস্থা হল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও খুব সুবিধা হয়।

উন্নত ধরনের মৃৎপাত্র—এই যুগে চাকা ঘুরিয়ে সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র বা মাটির বাসন-কোসন. হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি তৈরী হতে থাকে। এগুলি পুড়িয়ে নেওয়ায় খুব টেকসই হয়। জিনিসপত্র রাখা বা রান্নাবান্নার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হতে থাকে।

কাপড়-চোপড়—এই যুগে মানুষ সর্বপ্রথম কাপড় বুনতে শেখে। পশুর লোম, মসিনা ও তিসি গাছের বাকল এবং তূলার আঁশ থেকে সুতো তৈরী কর

হত। এই সূতো তাঁতে বুনে তৈরী হতে লাগল নানারকমের কাপড়-চোপড়। এইভাবে মানুষ তার নিজের কাপড়-চোপড়ও তৈরী করতে শিখে গেল।

ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাস—নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ যথেষ্ট নিরাপত্তা, সচ্ছলতা ও অবসর পাওয়ায় চিন্তা করার অবকাশ পায়। এই সময়েই ধর্ম, দেবদেবী প্রভৃতি সম্পর্কে তার মোটামুটি ধারণা গড়ে ওঠে।

এই যুগের মানুষ জমিকে দেবী বলে মানতে থাকে। তিনি যাতে বেশী ফসল দেন তার জন্য তাঁকে নানা উপহার দেওয়ার রীতি চালু হল। কখনও কখনও দেব-দেবীরও উদ্দেশ্যে মানুষও বলি দেয়া হতে লাগল। এই সময় এক ধরনের দেবীর বহু মূর্তি গড়া হয়। মানুষের ধারণা ছিল, এই মূর্তির পূজা করলে জমি উর্বরা হবে।

পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীকে খুব ভয়ভক্তি করা হত এই যুগে। তারা মারা যাওয়ার পরেও তাদের দেবদেবী জ্ঞানে পূজা করা হতে থাকে।

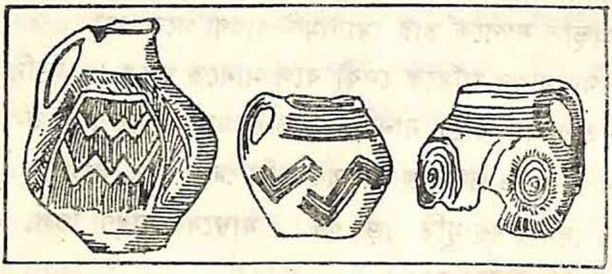
এই যুগের মানুষ জাদুমন্ত্র, তুকতাক ও ভাগ্যগণনায় খুবই বিশ্বাস করত। বিভিন্ন পরিবার বা বংশের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ছিল। এগুলিকে বলা হত টোটেম। সাধারণতঃ সূর্য, চন্দ্র, পশু-পাখী প্রভৃতি টোটেম বলে গণ্য হত। এদের রীতিমত পূজা করা হত।

খুবই আনন্দের কথা, এ ধরনের কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সম্পর্কেও মোটামুটি জ্ঞানলাভ করেছিল। এ যুগের মানুষের কীর্তিকলাপ বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে নব্যপ্রস্তরযুগে জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শীঘ্রই বিভিন্ন স্থানে, স্থানীয় প্রভাবের ফলে বিচিত্র ধরনের সভ্যতা গড়ে ওঠে। অবশ্য এ যুগে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত পশুপালক যাযাবরদের সংখ্যাও কম ছিল না। যাযাবরদের জীবনধারায় কিন্তু তেমন কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

ভাষা—নূতন প্রস্তরযুগে মানুষ বহু নূতন কথা ব্যবহার করতে শেখে। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য এই সময়েই ভাষার সূত্রপাত ঘটে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, এই ভাষা তখন খুব একটা উন্নত হয়নি।

শিল্প—নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ, শিল্পেরও ভক্ত ছিল। গুহা ও সমাধির গায়ে, মাটির পাত্রে তার আঁকা বা খোদাই করা প্রচুর ছবি পাওয়া গেছে। বিশেষ করে এ যুগের মাটির পাত্রগুলি ছিল ভারী সুন্দর। নানা রঙে রাঙা, বিচিত্র রকমের নক্‌সা ও ছবি আঁকা এই পাত্রগুলি এখনও আমাদের বিস্মিত



নব্য প্রস্তরযুগের শিল্প

করে। পুরাতন প্রস্তরযুগের গুহাচিত্রগুলি অবশ্য নব্য প্রস্তরযুগের গুহাচিত্র-গুলি অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর।

তৃতীয় অধ্যায়

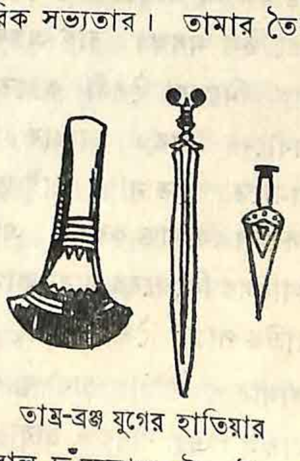
তাম্র-ব্রঞ্জ যুগ

নব্য বা নূতন প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি সময়ে তাম্র-ব্রঞ্জ যুগের শুরু। এ যুগের মানুষ শুধু পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকল না। তারা তাম্র বা তামা এবং টিন মেশান তামা বা ব্রঞ্জ দিয়ে জিনিসপত্র তৈরী করতে শিখল। এ যুগে পাথর ও তামার তৈরী জিনিসপত্র একসঙ্গে ব্যবহার করা হত বলে এযুগকে তাম্র-প্রস্তর যুগও বলা হয়। এই প্রথম মানুষ ধাতুকে নিজের কাজে লাগাল। এ ঘটনা ঘটে আজ থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে।

উদ্যোগী মানুষ হঠাৎ একদিন খুঁজে বার করল ঝক্ঝকে তামা। হয়ত কোন পাথরের সঙ্গে মিশে ছিল এই ধাতু।

মানুষ পাথরের ফাঁকে ফাঁকেও সন্ধান পেল প্রচুর তামার এবং শেষ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে পৌছে গেল একেবারে তামার খনিতে। তামাকে পিটিয়ে বা গালিয়ে তার ইচ্ছামত নানা জিনিস গড়তে লাগল মানুষ। শুরু হল ধাতুর যুগ।

এ যুগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাম্র-ব্রঞ্জ যুগের মানুষ একের পর এক বহু নূতন জিনিস আবিষ্কার করে নিজেদের জীবন ধারায় এনে ফেলল বিরাট পরিবর্তন। এর ফলেই শুরু হল উন্নত নাগরিক সভ্যতার। তামার তৈরী জিনিসপত্র তেমন শক্ত হত না বলে তার সঙ্গে অল্প টিন মিশিয়ে ব্রঞ্জ তৈরী হল ব্রঞ্জের যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রশস্ত্র ভেঙে গেলে তাদের গালিয়ে নিয়ে আবার নূতন জিনিস তৈরী করা যেত অতি সহজেই। তামা বা ব্রঞ্জকে নানা আকারও দেওয়া যায়। পাথরের ব্যাপারে এই সুবিধাগুলি নেই।



তাম্র-ব্রঞ্জ যুগের হাতিয়ার

পাথরের চেয়ে তামার যন্ত্রপাতি অনেক বেশী ধারাল, ছুঁচলো ও টেকসই হত।

তামা বেশী পাওয়া যেতনা বলে এ দিয়ে সাধারণত: অস্ত্রশস্ত্র, গয়নাগাঁটি ও ছোটখাট যন্ত্রপাতি বানানো হত। তামা ও ব্রঞ্জ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধাতু গালানোর বিদ্যা ও অন্য ধাতু খুঁজে পাবারউপায়ও আয়ত্ত করে ফেলে।

অধিক ফলন—তাম্র-ব্রঞ্জ যুগে জনসংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। অনেক লোক আবার চাষবাস ছেড়ে কারিগর ও ব্যবসায়ী বনে যায়। এদের খাওয়াবার জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি ফসলের। এদিকে চাষের জন্য নিত্যি নূতন জমিও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বাড়তি খাবার তৈরীর জন্য নূতন উপায় বার করা দরকার হয়ে পড়ে। মানুষ তখন জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে জমিকে উর্বরা করে তোলে। এভাবেই সে আয়ত্ত করল অধিক ফসল ফলাবার কায়দাটি। খেজুর, আঙুর, জলপাই প্রভৃতি ফলের গাছ লাগিয়েও বাড়তি খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব হল। এই বাড়তি খাদ্য প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা গেল বলেই তাম্র-ব্রঞ্জ যুগে শহর তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছিল। সে কথা পরে বলছি।

দক্ষ কারিগর—আগে মানুষ জুতো সেলাইথেকে চণ্ডীপাঠ সব নিজেই করত। হাতিয়ার বানানো, চাষবাস, কাপড় বোনা, বাড়ীঘর তৈরী সবই এক হাতে করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না: কিন্তু তাম্র-ব্রঞ্জ যুগে যারা তামা ও ব্রঞ্জ নিয়ে কাজ করত তাদের সারাদিন ঐ কাজ নিয়েই থাকতে হত। ঐ কাজে এত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সময় লাগত যে অন্য কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে তা করা ছিল অসম্ভব। তাই একদল দক্ষ ধাতুশিল্পীর সৃষ্টি হল, যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরী করতে পারত না। তারা খাদ্যের জন্য নির্ভর করত চাষীদের উপর। আবার চাষীরা তাদের দরকারী ধাতুর হাতিয়ার নিজেরা বানাতে পারত না। তাই তারা ধাতুশিল্পীদের কাছ থেকে খাদ্যের বিনিময়ে সেগুলি যোগাড় করত। এইভাবে কাপড় তৈরীর কাজটাও তিন শ্রেণীর কারিগর নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে করতে থাকে। অন্যেরা কেউ শুধু মাটির পাত্রই তৈরী করে, কেউ পেষে গম ও যব, কেউ হল ছুতোর, কেউ কামার, কেউ মুচি, চাষী বা পুরোহিত। অনেকে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই থাকল। এরা বণিক। চাষী ছাড়া অন্য কেউই খাদ্য ফলাত না। তাই কারিগর, বণিক ও পুরোহিতদের খাওয়াবার জন্যই দরকার হল প্রচুর বাড়তি খাদ্যের।

গ্রাম থেকে শহর—চাষের জন্য জঙ্গল কেটে জমি তৈরী করা, জলাজমি থেকে জল বার করে দেওয়া, শুকনো জমিতে জলসেচ, বাঁধ দিয়ে বন্যার জল আটকানো প্রভৃতি করতে হত। শত্রুর হাত থেকে ফসল ও ধনপ্রাণ রক্ষা করারও প্রয়োজন। এসবের জন্য বহুলোক একজায়গায় বাড়ীঘর বানিয়ে বাস করতে থাকে। কারণ এগুলিতো আর একা একা করা যায় না। নিজেদের শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ করার জন্য গ্রামের চারদিকে পাঁচিল বা দেওয়ালও তুলে দেওয়া হল। পাঁচিলের চারদিকে কাটা হল খাল বা পরিখা। বাড়তি খাদ্য ঘরে ছিল বলে কামার, কুমোর, বণিক প্রভৃতি পোষাও অসম্ভব হল না। জল, কাদামাটি বা পাথর কাছাকাছি থাকলে পাকা বাড়ী, পাকা রাস্তাঘাট বানাবারও কোন সমস্যা থাকল না। কাদামাটি দিয়ে ইট তৈরী করে রোদে শুকিয়ে নিলেই হল। কাঠকুটো জ্বেলে এই ইট পুড়িয়ে নিলেই পাথরের মত শক্ত ইট হাতে এসে যেত। এবার বাড়ী বানালেই হয়। মানুষ এখন আর অল্পে তুষ্ট হল না। সে নানা জিনিসের অভাব বোধ করতে লাগল। এই অভাব মেটাবার জন্যেই বণিকেরা দূর-দূরান্তর থেকে নানা জিনিস এখানে এনে বিক্রি করতে লাগল, এখানকার বাড়তি ফসল ও অন্যান্য জিনিস কিনে বেচে এল অন্য জায়গায়। এই ভাবেই এক একটা বড় গ্রাম শহরে পরিণত হল। কোনও শহরে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে কিছু লোক অন্য কোথাও গিয়ে তৈরী করত নূতন শহর। দেবদেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করেও অনেক সময় শহর গড়ে উঠত।

ব্যবসা-বাণিজ্য—যেখানে বড় গ্রাম বা শহর, সেখানেই বণিকদের আনাগোনা। বণিকেরা নানা দূর দূর দেশ থেকে নিয়ে আসত কারিগরদের জন্য তামা-ব্রঞ্জ প্রভৃতি কাঁচামাল, দুর্ভিক্ষের সময় দূরদেশ থেকে খাদ্য, উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার ও জিনিসপত্র। বিলাসব্যসনের নানা সামগ্রী, বাড়ী তৈরীর জন্য কাঠ প্রভৃতির যোগান দিত তারাই। এর বদলে তাদের দিতে হত খাদ্য, পোশাক, আরও কত কি। এক জিনিসের বিনিময়ে বা বদলে অন্য জিনিস নেওয়ার মধ্য দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। অনেক সময় সোনা বা রূপোর টুকরোর বদলেও জিনিসপত্র কেনা-বেচা হত।

নূতন-নূতন শ্রেণী—তাম্র-ব্রঞ্জ যুগের সমাজে বেশ পরিবর্তন দেখা গেল। পেশা ও মর্যাদা অনুযায়ী এ যুগের মানুষ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হল। কেউ

কেউ চাষবাস নিয়ে থাকল, তাদের বলা হত চাষী। যারা পশু চরাত, তারা হল পশুপালক। এইভাবে কেউ হল কারিগর, কেউ তাঁতী, কেউ বা ব্যবসায়ী। এইভাবে পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী শ্রেণীর সৃষ্টি হল। মর্যাদা অনুসারে দেখা দিল, বিজয়ী ও বিজেতা, রাজা ও প্রজা, ধনী ও গরীব, মালিক ও শ্রমিক, প্রভু ও ক্রীতদাস। সমাজে গরীবদের সংখ্যাই ছিল বেশী। ধনীদের বিরুদ্ধে তাদের যথেষ্ট অভিযোগও ছিল। তামা ও ব্রঞ্জ মূল্যবান ধাতু বলে ধনীরাই ঐ ধাতু দিয়ে তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারত। এগুলি দিয়েই তারা দাবিয়ে রাখত গরীবদের আর আক্রমণ করত প্রতিবেশী জাতিগুলির গ্রাম ও নগর।

জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ—তাম্র-ব্রঞ্জ যুগে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হত। সচ্ছল স্থায়ী বাসিন্দাদের হিংসা করত গরীব যাযাবরেরা। তারা সুযোগ পেলেই গ্রাম নগর লুঠ করত, কেটে নিয়ে যেত পাকা ফসল, কেড়ে নিত গরু বাছুর আর লোকজন। তাই এদের বিরুদ্ধে স্থায়ী বাসিন্দাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। পাহাড়-পর্বত থেকে সহজেই তামা যোগাড় করতে পারত বলে যাযাবরদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল প্রচুর। স্থায়ী বাসিন্দারা এদের সঙ্গে পেরে উঠত না।

বাড়তি খাদ্য ফলাবার জন্য দরকার হত নূতন জমির। এক জাতি বা গোষ্ঠী অন্য জাতি বা গোষ্ঠীর জমি দখল করতে গেলেই যুদ্ধ বাধত। লোভের বশে একে অন্যের উর্বরা জমি ও সমৃদ্ধ শহরও গ্রাস করতে চাইত। এগুলিই ছিল যুদ্ধের প্রধান কারণ।

রাষ্ট্রের জন্ম—শক্তসমর্থ যাযাবরদের কোন নেতা উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে গ্রাম ও নগর দখল করে সেখানকার অধিপতি বা রাজা হয়ে বসত। তারা নিজেরা চাষবাস করত না। প্রজাদের খাটিয়ে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস তৈরী করাত। যে সকল লোক সহজে জমি পরিষ্কার বা জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারত তারাই শেষ পর্যন্ত নেতা বা রাজা হয়ে বসত। শক্তিশালী লোকেরা শত্রুর হাত থেকে গ্রাম-নগর রক্ষা করে বা অন্যের গ্রাম-নগর দখল করে নেতা বা শাসক হয়ে দাঁড়াত। সে যুগে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পুরোহিতরা হলেন দেবতাদের প্রতিনিধি। সুতরাং তারা পুরোহিতদের খুব

সম্মান করত। অনেক সময় এই পুরোহিতরাই রাজা হতেন। এই সকল নেতা ও পুরোহিতেরা লোকেদের খাটিয়ে, তাদের বিপদে-আপদে থেকে রক্ষা করে, প্রয়োজনমত শাস্তি ও পুরস্কার দিয়ে নিজেদের রাজা বা শাসক বানাল। রাজাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল রাষ্ট্র।

নদ-নদীর তীরে তীরে সভ্যতা—এখনকার মত প্রাচীনকালেও নদ-নদীর তীরে, তীরেই বড় বড় শহর ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এইভাবে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে ওঠে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, নীল-নদের তীরে মিশরের সভ্যতা, সিন্ধুনদ ও তার শাখা নদীর তীরে তীরে সিন্ধু-সভ্যতা এবং হোয়াং হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর তীরে চীনের সভ্যতা।

যেখানে নদী, সেখানেই উন্নত গ্রাম ও নগর। কেন, বল দেখি! এর কারণ খুবই সহজ। (১) নদী থেকে খাল কেটে ফসলের জমিতে জলসেচের বড়ই সুবিধা। এতে ফলন বেশ ভাল হয়। বৃষ্টির জন্য তখন আর হাঁ করে বসে থাকতে হয় না। প্রখর রোদেও ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। (২) জল দিয়ে মাটি ছেনে মাটির ঘর বানানো যায়, পাকা বাড়ীর জন্য ইটও তৈরী করা যায় সহজেই। (৩) বহু মানুষের খাবার জল, রান্নার জল, ধোওয়া-মোছা ও জিনিসপত্র তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় জল নদী থেকেই পাওয়া সম্ভব। (৪) নদীর মাছও বড় খাদ্য। নদীতীরে ঘাস থাকায় পশুপালনও সম্ভব হয়। (৫) নদীর বন্যায় দুই তীরের জমি ভেসে যায়। পলিমাটি পড়ে জমি উর্বরা হয় এবং সহজে প্রচুর ফসল ফলে। তাই মানুষ যথেষ্ট অবসর পায় এবং ধর্ম, দর্শন, সাহিত , বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। এইভাবেই মানুষ উন্নত হয়, সভ্যতা গড়ে ওঠে। (৬) নদীতীরে বসবাস করলে নৌকা বা জাহাজে করে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব সুবিধা। তাই নদ-নদীর তীরেই বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস বলতে কি বোঝ লেখ। ইতিহাস পড়ে কোন লাভ হয় কি ?

২। ইতিহাসের উপকরণ কাকে বলে ? দুটি উপকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৩। কারা প্রথম আগুনের ব্যবহার শেখে ?

৪। আগুন ব্যবহার করে কি সুবিধা পাওয়া গিয়েছিল ?

৫। পিকিং মানব কোথায় বাস করত? তার সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে লেখ।

৬। পুরাতন প্রস্তরযুগের কয়েকটি হাতিয়ারের নাম লেখ। এ যুগকে পুরাতন বলা হত কেন?

৭। নূতন প্রস্তরযুগ কাকে বলে?

৮। কৃষি, চাকা ও তাঁত কোন যুগে আবিষ্কার করা হয়েছিল? মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করল কেন?

৯। পুরাতন ও নূতন প্রস্তরযুগের গুহাচিত্রের মধ্যে পার্থক্য কি?

১০। নূতন প্রস্তরযুগের লোকের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল?

১১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) তামার কাজ যারা করত তাদের বলা হত —— কারিগর।

(খ) শহর গড়ে ওঠে —— যুগে।

(গ) প্রাচীন —— গুলি গড়ে ওঠে ——।

(ঘ) ——বাড়তি ফসল ফলাতে সাযায্য করে।

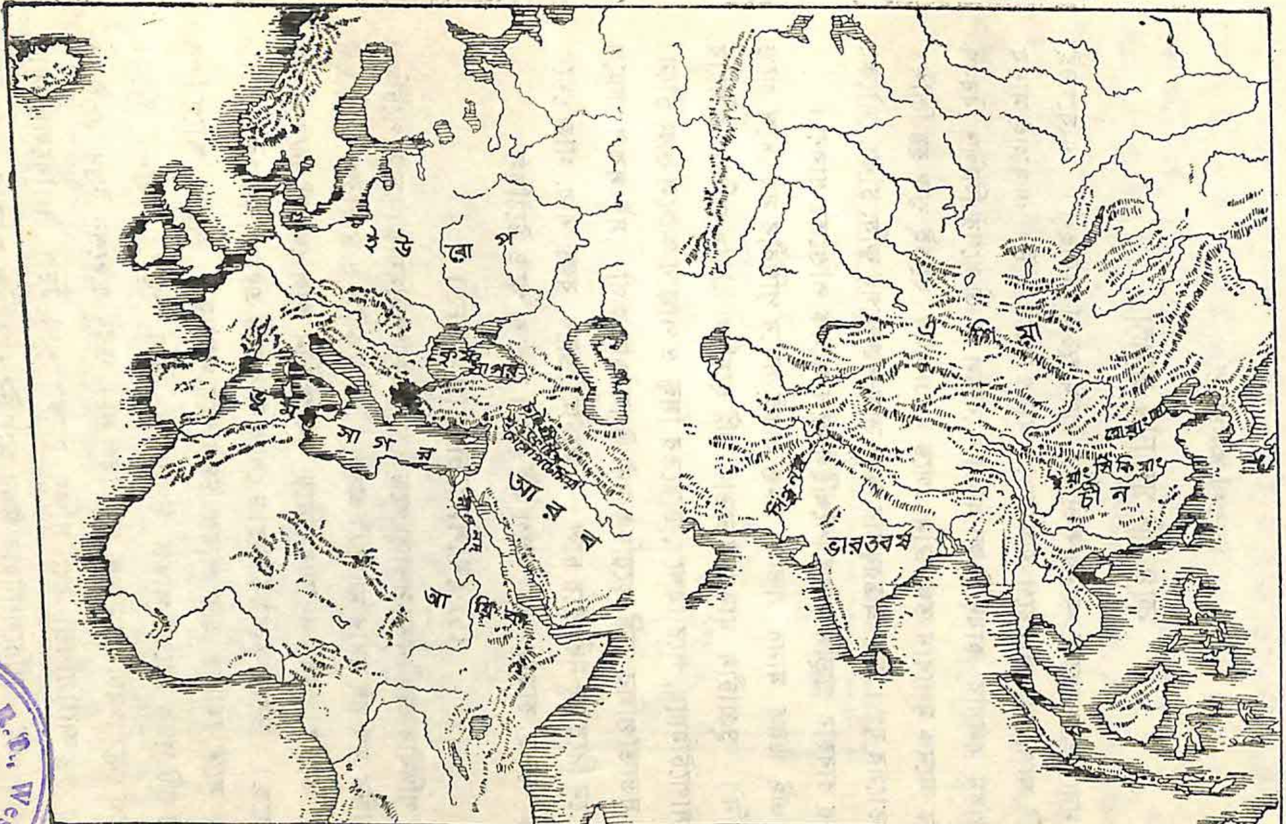
(ঙ) প্রাচীনকালে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত —— মাধ্যমে।

১২। শুদ্ধ উত্তরটি খাতায় লেখ :—

(ক) লিখিত ইতিহাসের আগের যুগকে বলা হয় ঐতিহাসিক যুগ/ প্রাগৈতিহাতিক যুগ/তাম্র-প্রস্তর যুগ।

(খ) মানুষ প্রথমে ছিল খাদ্যসংগ্রহকারী / খাদ্যউৎপাদনকারী / ধাতুর হাতিয়ার প্রস্তুতকারী।

(গ) চাকা ঘুরিয়ে মাটির পাত্র তৈরী হয় পুরাতন প্রস্তরযুগে / নূতন প্রস্তর-যুগে / লৌহ যুগে।



প্রাচীন সভ্যতাগুলির অবস্থান (১) নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা। (২) টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের তীরে সুমেরীয় সভ্যতা। (৩) সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধুসভ্যতা এবং (৪) হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং-এর তীরে চীনের সভ্যতা।

চতুর্থ অধ্যায়

কয়েকটি সুপ্রাচীন সভ্যতা

নব্য প্রস্তরযুগেই মানব সভ্যতার প্রথম সূচনা ঘটেছিল। এ যুগেরই একটি অংশ, তাম্র-ব্রঞ্জ যুগে এ সভ্যতার আরও উন্নতি ঘটে। এ যুগেই মানুষ সর্বপ্রথম লেখার কায়দাটি আবিষ্কার করেছিল। এ যুগের লিখিত বিবরণ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। এ সময় থেকেই সুরু হয় লিখিত ইতিহাসের যুগ। নব্য প্রস্তরযুগের অংশ তাম্র-ব্রঞ্জ যুগেই কৃষি, চাকা, নৌকো, ধাতুর ব্যবহার প্রভৃতি মানুষ শিখেছিল বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা।

এই উন্নত মানব সভ্যতা কিন্তু একই সময়ে পৃথিবীর সব দেশে গড়ে ওঠেনি। সুপ্রাচীন মানব সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল প্রথমে পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়ায়, পরে মিশরে, ভারতের সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে এবং চীনে। এই সভ্যতাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল নদী উপত্যকায় অর্থাৎ সেই সকল অঞ্চলে যেখানে দিয়ে নদ-নদী বয়ে চলে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছ' হাজার বছর আগে এই সকল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

(১) মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে ওঠে মেসোপটেমিয়ায়। মেসোপটেমিয়া কথাটির অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নামে দুটি নদী তাদের শাখা নদীদের নিয়ে খুব প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে বয়ে চলেছে। উত্তরে তুরস্কের পাহাড় থেকে বার হয়ে এরা দক্ষিণ দিকে এসে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। অনেক আগে কিন্তু নদী দুটি পৃথক ভাবেই পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়ত। অনেক অনেক আগে মেসোপটেমিয়া নামটা চালু ছিল না। তখন এদেশের উত্তর দিকটাকে বলা হত অ্যাসিরিয়া এবং দক্ষিণ দিকের নাম ছিল ব্যাবিলোনিয়া। আবার এই ব্যাবিলোনিয়ার উত্তর অংশটির নাম ছিল আক্কাদ এবং দক্ষিণ অংশকে বলা হত সুমের। মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম ইরাক।

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মোহানা বা মুখের কাছে পলিমাটি দিয়ে গড়া ও জলা-জঙ্গলে ভরা স্যাঁতসেঁতে জায়গাটিই সুমের। প্রধানতঃ এই অঞ্চলেই ইরেক, উর, এরিদু প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরের আবির্ভাব হয়। এই অঞ্চলের উত্তরের নগরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অপিস, কিস, ব্যাবিলন, ইরেক প্রভৃতি। ইউফ্রেটিসের স্রোত কম ও তাতে সারা বছর ধরে জলও থাকে। তাই তার তীরেই বেশীর ভাগ নগর গড়ে উঠেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটি খুঁড়ে এই সকল নগরের ভাঙা-চোরা নিদর্শন বা ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বার করেছেন।



নদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরী সুমের বা মেসোপটেমিয়া খুবই উর্বর। তাই আদিম কাল থেকেই বহু জাতি পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমি পেরিয়ে এদেশে বাস করতে এসেছে। সুমেরীয় নামে এক জাতি পূবের কোন দেশ, হয়ত বা ভারত থেকেই এদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এদের গায়ের রঙ কালো, চুল, দাড়ি-গোঁফ সব কামান, দেখতে মোটাসোটা।

মেসোপটেমিয়ায় কেন প্রথম সভ্যতা?—তোমরা হয়ত জানতে চাইবে, কেন মানব সভ্যতা সবার আগে মেসোপটেমিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল? এর উত্তরে বলি, সভ্যতা বিকাশের জন্য যা যা দরকার তার সবকটিই খুব বেশী পরিমাণে এ অঞ্চলে পাওয়া যেত। এরকমটি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। এখানে ছিল (১) কৃষির উপযোগী উর্বরা জমি, জলসেচের সুবিধা, প্রচুর রোদ, বোনার জন্য বুনো গম ও যবের দানা এবং খেজুর, জলপাই, ডুমুরগাছ ও আঙুরলতা। (২) নদীর তীরে, তীরে প্রচুর ঘাস থাকায় পশুপালনের সুবিধাও ছিল খুব। ভেড়া, মোষ, শূয়োর প্রভৃতি পশু বুনো অবস্থায় এখানে প্রচুর পাওয়া যেত। (৩) ঝোপ-ঝাড়ে শিকারের উপযোগী পশুপাখীও কম ছিল না। (৪) নদীগুলি ভরা ছিল চমৎকার সুস্বাদু মাছে—যা মানুষের একটা প্রধান খাদ্য। এখানে সহজেই খাদ্য ফলানো বা পাওয়া যেত এবং তা ফলানো যেত প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং মানুষ যে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে!

(৫) এই অঞ্চলে বাড়ীঘর বানাবার জন্য নলখাগড়া ও কাদামাটি প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যেত। কাদামাটি দিয়ে ইট তৈরী করে রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে পাকা বাড়ীও তৈরী করা যেত অনায়াসে।

(৬) যে সব জিনিষ বা কাঁচামাল এই অঞ্চলে পাওয়া যেত না, চাকাওলা গাড়ী করে, পশুর পিঠে বা নৌকা-জাহাজে করে তা সহজেই যোগাড় করা যেত। এর বিনিময়ে দেবার মত ঘরে জমা ছিল প্রচুর গম ও যব। নদী-নালা থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনেরও মস্ত সুবিধা ছিল।

(৭) খোলা নীল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি ভাল করে দেখারও সুযোগ ছিল এখানে। এর ফলে জন্ম নিল জ্যোতির্বিদ্যা, সময় ও ঋতু সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রভৃতি।

মেসোপটেমিয়ার তিন ধারেই রুক্ষ, কর্কশ মাটি। নালা কেটে জলার জল শুকনো জায়গায় সরিয়ে দিতে পারলেই জমি চাষের উপযোগী হয়ে পড়ত। জঙ্গল সাফ করতে আর কদিন লাগে!

কত উর্বর এই জমি!—কেমন উর্বর ছিল এই মাটি, শুনবে? যে বীজ বোনা হত তার প্রায় একশ' গুণ বেশী ফলন হত এখানে। বিশেষ করে

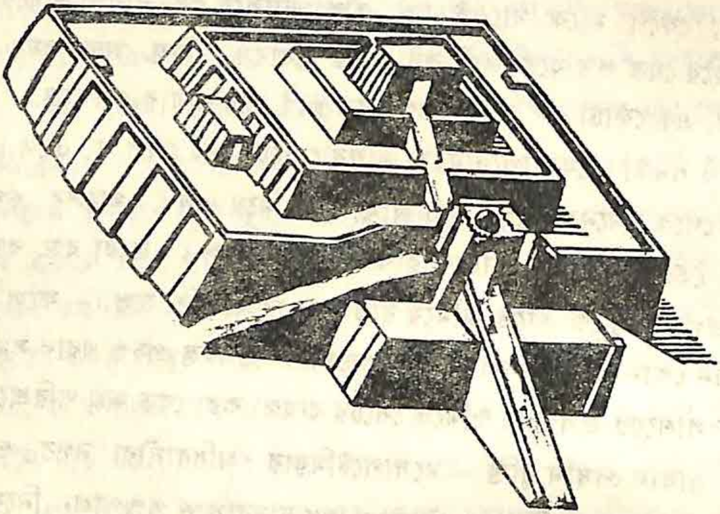
সুমের অঞ্চলে। কত রকম ফলের গাছ ছিল, সে-ত আগেই বলেছি। এখানকার ফসলের মধ্যে প্রধান ছিল গম ও যব।

বন্যা প্রতিরোধ—মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে প্রায়ই বন্যা হত। নদীগুলি ফুলে, ফেঁপে মাঝে মাঝেই দুই তীর ভাসিয়ে বহু জায়গা ডুবিয়ে দিত। নষ্ট হয়ে যেত কত যত্নে তৈরী করা ক্ষেত-খামার। কিন্তু অন্য সময় প্রখর রোদ, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যাবার যোগাড়। এ এক বিরাট সমস্যা। মেসোপটেমিয়ার মানুষ মোটেই ভয় পেল না এতে। তারা নদী থেকে অনেক খাল কেটে জমি পর্যন্ত নিয়ে এল। খালের ওপর উঁচু বাঁধ তৈরী করে জল আটকে রাখার ব্যবস্থা করল। তারা বড়, বড় পুকুর বা জলাশয় খুঁজে তাতে জমিয়ে রাখত বন্যার বাড়তি জল। ফলে বন্যায় তেমন কোন ক্ষতি হত না চাষের ক্ষেতের। উপরন্তু প্রচণ্ড খরার সময় খাল ও জলাশয়ের জল দিয়ে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেত অল্প পরিশ্রমে।

প্রধান প্রধান বৃত্তি—মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা নগর ও নগর-সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তাই তারা শুধু চাষবাস ও পশুপালন নিয়েই ব্যস্ত থাকত না। হরেক রকম কাজ করত তারা। কেউ ছিল কারিগর, তামা বা ব্রঞ্জের জিনিসপত্র বানাত, কেউ বুনত তাঁত, কারো বা পেশা নানারঙের ও নানা ধরনের মাটির পাত্র চাকার সাহায্যে তৈরী করা, কেউ হত ছুতোর, কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ বণিক বা ব্যবসাদার। কেউ কেউ সোনারূপোর গয়না গড়ত, কেউ বা তৈরী তৈরী করত পাথরের স্তম্ভ, মূর্তি, গদা আরও কত কি! কেউ আঁকত ছবি, কেউ করত পুরোহিতের কাজ, কেউ বা ছিল ক্রীতদাস, অন্যের সেবা করাই যার কাজ। সবার উপরে ছিলেন শাসক ও তাঁর কর্মচারীরা।

উজ্জ্বল কীর্তির দেশ সুমের—সুমেরীয়দের নানা কীর্তিতে সুমের বা মেসোপটেমিয়া এখনও উজ্জ্বল। কি বিশাল আর কত উঁচু মন্দির তারা করেছিল, দেখলে অবাক হতে হয়। হাজার হাজার লোক মিলে দীর্ঘদিন ধরে বহু পরিশ্রমে এক একটি মন্দির গড়ে তুলেছে। ইরেকে ২৪৫ ফুট (৭৪·২৫ মিটার) লম্বা ও ১০০ ফুট (৩০·৩৪ মিটার) চওড়া এক বিরাট মন্দির ছিল। সাধারণতঃ রোদে শুকানো ইটে মন্দিরগুলি তৈরী হত।

কখনো কখনো রোদে শুকনো ইট দিয়ে তৈরী করা হত উঁচু পাহাড়ের মত দেখতে ভিত বা মেঝে। তার উপর তৈরী হত ছ-সাত তলা উঁচু মন্দির। এ ধরনের মন্দির উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠে যেত। একেবারে



জিগ্‌গুরাট

চূড়ায় থাকত একটি ছোট মন্দির। পরবর্তীকালে এই ধরনের পাহাড়-মন্দিরকে বলা হত জিগ্‌গুরাট। এগুলির উপর তলায় ওঠার জন্য সিঁড়ির বদলে ঢালু রাস্তা তৈরী করা হত। তখন সিঁড়ির ব্যবহার জানা ছিল না।

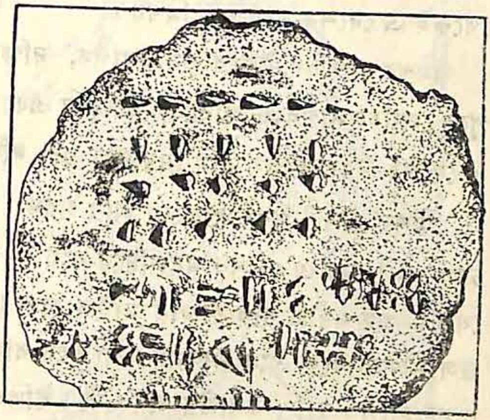
সুমেরীয়দের শিল্প-প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে দেয়ালে আঁকা সুন্দর সুন্দর চিত্রে, মোজায়েকে অর্থাৎ ছোট ছোট ঝিনুক, পাথর প্রভৃতি জুড়ে তৈরী করা চিত্রে আর নানা ধরনের পাথরের মূর্তিতে। পাথরের মূর্তিগুলির সূক্ষ্ম কারুকাজ খুবই সুন্দর ছিল। মূর্তিগুলি দেখতে বেশ জীবন্ত হলেও তেমন সুন্দর ছিল না।

সুমেরীয়গণ চাকাওলা গাড়ী আবিষ্কার করে সেটি পশু দিয়ে টানাতে থাকে। জলপথে চলার জন্য তারা বানায় নৌকা ও জাহাজ। এর ফলে যাতায়াত, এক স্থানের সঙ্গে অন্য স্থানের যোগাযোগ স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্যের খুবই সুবিধা হয়েছিল।

সুমেরীয়গণ প্রচুর বাড়তি ফসল ফলাত বলেই তা অন্য দেশে বিক্রী করতে চাইল। এর বদলে তারা নানা দেশ থেকে নিয়ে এল কত দরকারী

জিনিসপত্র ও বিলাসের সামগ্রী। পারস্য উপসাগরের কূলে অবস্থিত ওমান থেকে এল তামা, পূর্ব ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে এল টিন, ভারত থেকে কাপড়-চোপড়, মাটির রঙবেরঙের পাত্র, মাদুলি ইত্যাদি; পূবের পাহাড়ী দেশ থেকে কাঠ ও পাথর, নানা দেশ থেকে মণিমুক্তো, ক্রীতদাস আরও কত কি আসত! এর বিনিময়ে সুমের শুধু খাদ্যশস্যই দিত না, তামার জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মাটির পাত্রও দিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এক দেশের লোক অন্য দেশের অধিবাসীর অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার, শিল্প, চিন্তাধারা প্রভৃতিও জেনে যেত। বাণিজ্যের ফলে দেশগুলি সচ্ছল হয়েও উঠেছিল।

সুমেরীয়দের সব থেকে বড় কীর্তি হল লিখন-রীতির আবিষ্কার। কাদা মাটির চাক্‌তিতে নলখাগড়া বা ঐ জাতীয় কাঠি দিয়ে তারা খোঁচা খোঁচা দাগ দিয়ে হরফ লিখত। এগুলি ছিল তীর বা বাণের মুখের মত কোণাযুক্ত হরফ। এজন্য এর নাম কৌণিক বা কিউনি-ফর্‌ম লিখন-রীতি। 'কর্', 'বন্' প্রভৃতি শব্দের অংশ বোঝাবার জন্য সুমেরীয়রা কয়েকটি চিহ্ন ব্যবহার করত। এগুলিকে বলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন অর্থাৎ যা সঙ্কেত বা ইঙ্গিত করে। এই চিহ্নগুলি পরপর বসিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা হত। মাটির চাকতি রোদে শুকিয়ে নিলে বহুদিন টিকে যেত। পাথরের স্তম্ভে, পাথরের গদার মাথায়ও এধরনের লেখা পাওয়া গেছে। এ লেখাগুলি থেকে রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ বিগ্রহ মন্দির স্থাপন, দেবদেবীর স্তবস্তুতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক কথাই জানা গেছে। সুমেরীয়দের লেখা যিনি সর্বপ্রথম পড়তে পারেন তাঁর নাম স্যর হেনরি রলিনসন।


কিউনিফর্‌ম লিখন-রীতি

মেসোপটেমিয়ার নগরগুলি প্রায়ই একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। বিদেশী আক্রমণও ঠেকাতে হত তাদের। তবুও দীর্ঘকাল ধরে তারা

থেকেছে এবং গড়ে তুলেছে এক অতি উন্নত সভ্যতা। পরবর্তীকালে এখানেই গড়ে উঠেছে ব্যাবিলোনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতা। এই উভয় সভ্যতাই ছিল সুমেরীয় সভ্যতার কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী।

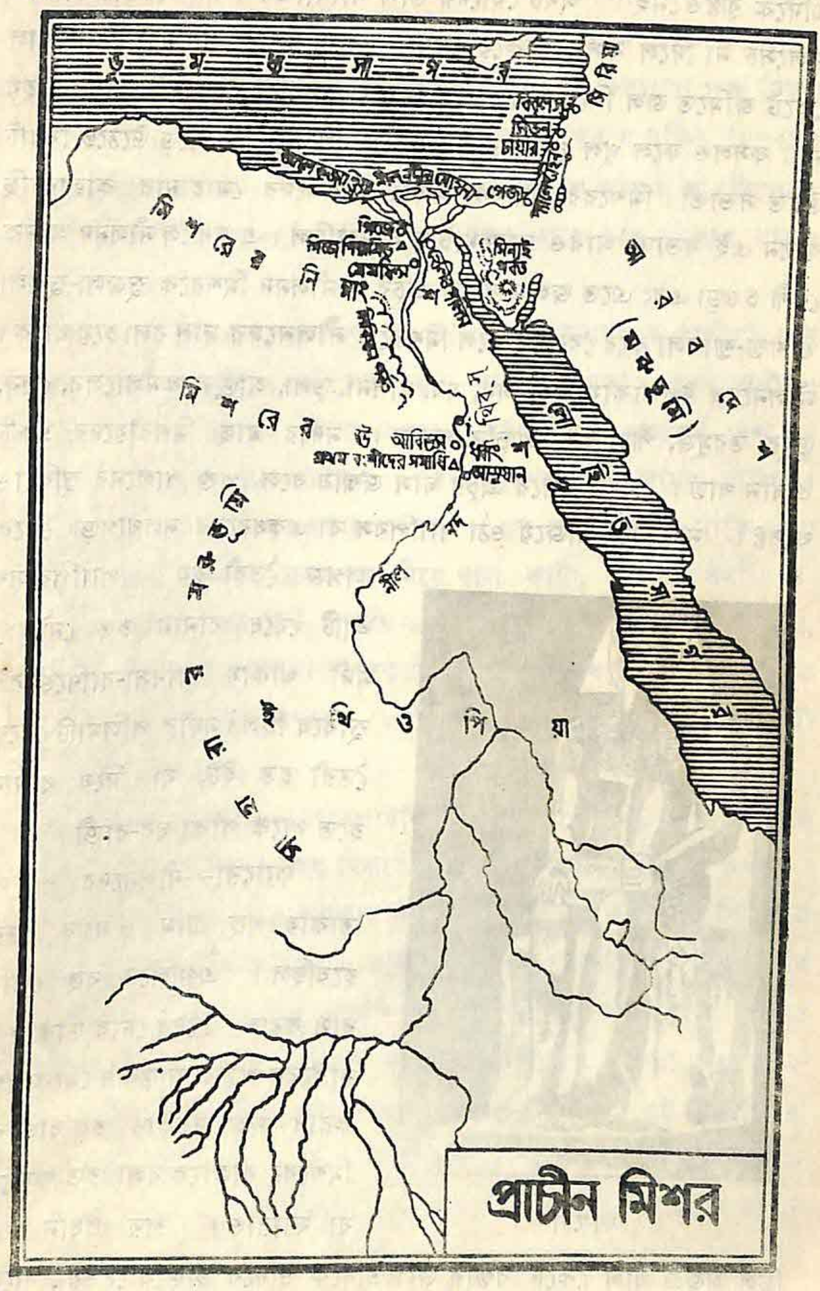
(২) ইজিপ্ট বা মিশরের সভ্যতা

মেসোপটেমিয়ার সভাতার মতই ঈজিপ্ট বা মিশরের সভ্যতা অত্যন্ত উন্নত ছিল। এখানেও একটি নদীর ধারে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। এটি নালনদ নামে পরিচিত।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ঈজিপ্ট বা মিশর দেশ অবস্থিত। ঈজিপ্ট কথাটির অর্থ কাল দেশ। কারণ এখানকার মাটির রঙ কাল। প্রাচীন হিব্রু জাতির লোকেরা এই দেশকে ম্যাজন বা ম্যাসর বলত। এ থেকেই এ দেশের নাম হয় মিশর।

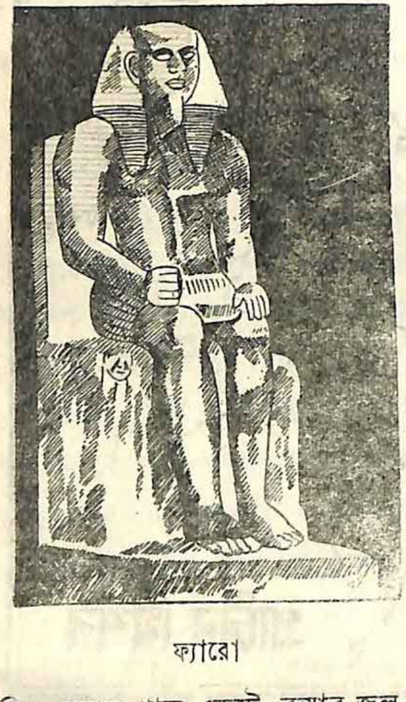
মিশর দেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে ইথিওপিয়ার পর্বতমালা। পূর্বে লোহিতসাগর ও আরবের মরুভূমি এবং পশ্চিমে সাহারার মরুঅঞ্চল। এ দেশের উত্তরাঞ্চলের নাম নিম্নাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলকে বলা হয় উর্ধ্বাঞ্চল।

মিশর দেশটি খুবই শুকনো আর গরম। এখানে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। নীলনদ এ দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে না গেলে হয়ত এটি মরুভূমিই হয়ে যেত। এই নদীটি চার হাজার মাইল লম্বা (৬৪০০ কিলোমিটার)। এর জল নীলচে বলে একে নীলনদ বলা হয়ে থাকে। মিশরবাসীরা নীলনদকে বলত হাপি। হাপি কথাটির অর্থ নদী। ইথিওপিয়ার পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে এই নদ ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে এই নীলনদ বন্যা সৃষ্টি করে। বৃষ্টি ও বরফগলা জলে ফুলে ফেঁপে এই নদ ও তার শাখা-প্রশাখা মিশরের বহু জায়গা ডুবিয়ে দেয়। এইসব অঞ্চলে এক মাসের বেশী সময় ধরে জল দাঁড়িয়ে থাকে। জল সরে গেলে দেখা যায় নদের দুধারে পড়ে আছে পুরু কাল রঙের পলির স্তর। প্রতি বছর এই বন্যা হয় বলে ৩০। ৪০ ফুট (৯। ১২ মিটার) পুরু পলি জমে উঠেছে মিশরের মাটিতে। এই পলিমাটি খুবই উর্বর। এসে শস্যদানা ছড়িয়ে দিয়ে প্রচুর ফসল ফলে। মিশরবাসীরা বন্যার বাড়তি জল খাল কেটে দূরের শুকনো মাটিতে নিয়ে গিরে চাষবাস করে। বন্যা শেষ হয়ে যাবার পর ধীরে ধীরে নদীর জল কমে আসে।



প্রাচীন মিশর

এদিকে বৃষ্টিও নেই। অথচ রোদের তাপ সাংঘাতিক। এ অবস্থায় জমিতে জলসেচ না দিলে ফসল শুকিয়ে যাবে। এজন্য মিশরীয়গণ নদী থেকে খাল কেটে জমিতে জল নিয়ে যায়। তাই মিশরে চাষবাসের কোনই অসুবিধা হয় না। ফসলও ফলে খুল খুব। তাই এই নীলনদের দুধারে গড়ে উঠেছে বিরাট উন্নত সভ্যতা। মিশরের নিম্নাঞ্চল অর্থাৎ নীলনদের মোহানার কাছাকাছি স্থানে এই সভ্যতা আরও জমজমাট হয়ে উঠেছিল। এ অঞ্চলে নীলনদ অনেক বেশী চওড়া এবং এতে জলও থাকে প্রচুর। নীলনদ মিশরকে সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা করে রেখেছে বলে মিশরকে **নীলনদের দান** বলা হয়ে থাকে। নীলনদের উপত্যকায় প্রচুর গম, যব, মসিনা, তুলা, আঙুর, কমলালেবু, লেবু, ডুমুর, তরমুজ, পীচ, কলা প্রভৃতি জন্মায়। নদীর মাছ মিশরীয়দের একটি প্রধান খাদ্য। নদীর তীরে প্রচুর ঘাস জন্মায় বলে পশু পালনের সুবিধাও যথেষ্ট। নদীতীরে গজিয়ে ওঠা প্যাপিরস বা একধরনের নলখাগড়া থেকে কাগজ তৈরী হয়। প্যাপিরসের আঁটি বেঁধে বানান হত নৌকা। নদী থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুবিধে ছিল। নদীর পলিমাটি থেকে তৈরী হত ইট, যা দিয়ে বানান হতে থাকে পাকা ঘর-বাড়ী।


ফ্যারো

ফ্যারো—নীলনদের উপত্যকায় বহু গ্রাম ও নগর তৈরী হয়েছিল। এগুলিতে বহু লোক বাস করত। এদের চোর ডাকাত ও বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য দরকার হল রাজার। মিশরের রাজাকে বলা হত ফ্যারো বা ফ্যারাও। তাঁর প্রধান কাজ ছিল অজস্র খাল কেটে বন্যার জল এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দেওয়া, খালের সাহায্যে নদীর জল জমিতে পৌঁছে দেওয়া এবং জল ঊর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলে

সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া। তিনি তাঁর রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন এবং মরুভূমির বেদুইনদের আক্রমণ হতে জনগণের ফসল ও সম্পদ রক্ষা করতেন। এরবিনিময়ে প্রজারা তাঁকে কর হিসাবে ফসল বা পশু দিত।

মিশরের প্রথম রাজার নাম **মেনেস**। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে নিজের অধীনে আনেন। তিনি মিশরে প্রথম রাজবংশ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পর ৩১টি রাজবংশ প্রায় তিন হাজার বছর ধরে মিশরে রাজত্ব করে।

ফ্যারো কথাটির অর্থ বড় বাড়ী বা প্রাসাদ। রাজারা বড় বাড়ীতে বাস করতেন বলেই তাদের এরকম নাম হয়। রাজার ক্ষমতাও ছিল অসীম। তিনি আইন রচনা করতেন, বিচার করতেন, কর্মচারীদের কাজকর্ম দেখতেন এবং যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করতেন। তিনি দেশের সমস্ত জমির মালিক। তিনি নিজেকে দেবতা বলে প্রচার করতেন। সূর্য দেবতা 'রা' নাকি তাঁর পিতা। রাজা ক্রীতদাস প্রজাদের নিয়ে খাল কাটা, রাজার সমাধি ব পিরামিড বানানো, রাস্তাঘাট প্রভৃতি করিয়ে নিতেন। লোকের ধারণা ছিল, রাজা নানা যাদুমন্ত্রের সাহায্যে দেশকে উর্বরা করে রেখেছেন। ফ্যারোদের রাজধানী ছিল মেমফিস্ নগরে। এটি ছিল মিশরের বর্তমান রাজধানী কায়রো শহরের কাছে।

পুরোহিত সম্প্রদায়—মেসোপটেরিয়ায় আমরা দেখেছি, পুরোহিতরাই প্রথমে রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু মিশরেপুরোহিতরা ছিলেন রাজার অধীনে। তাঁরা রাজার জীবিত ও মৃত অবস্থায় তাঁর কল্যাণকামনা করতেন। বিনিময়ে রাজা তাঁদের জমি দান করতেন। রাজারা নির্দেশ পুরোহিতগণ দেব-দেবীর পূজাও করতেন। রাজার সঙ্গে পুরোহিতদের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। মিশরে পুরোহিতরাই প্রথম লিখন-রীতির আবিষ্কার করেন। তাঁরা নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও করতেন। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, এই পুরোহিতরা অনেক যাদুমন্ত্র জানতেন। তারা তাঁদের কাছ থেকে কবচ-মাদুলি কিনে অপদেবতার নজর থেকে নিজেদের রক্ষা করত। একজন ফ্যারোর প্রধান পুরোহিত ছিলেন ইম্‌হটেপ। তিনিই মিশরে প্রথম থাক-কাটা পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে পরে আরও কিছু বলব। ইম্‌হটেপ

ছিলেন একাধারে ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও গণিতবিদ্। মিশরে সভ্যতার আলো বিস্তারের ব্যাপারে পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য সব পুরোহিতরাই ভাল ছিলেন না। কেউ কেউ খুবই লোভী ছিলেন, জনগণকে ঠকিয়ে পয়সা নিতে তাদের বাধত না।

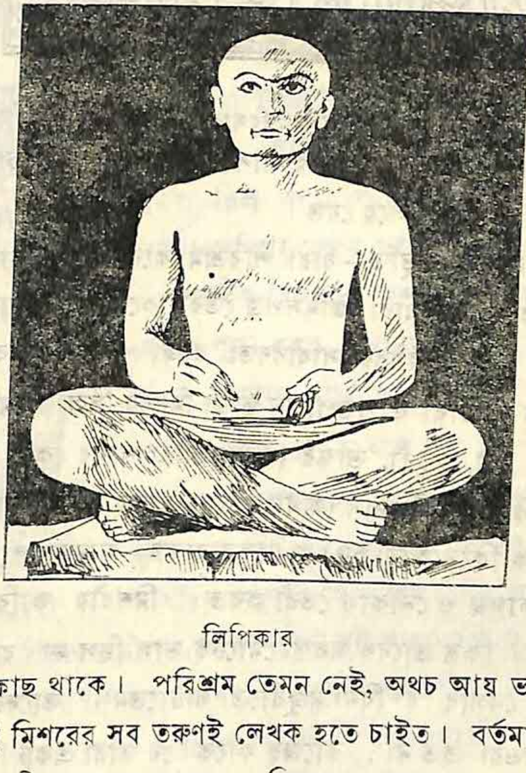
লিখন-রীতি—লিখতে না জানলে অনেক ঝামেলা দেখা দেয়। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া, হিসাবপত্র রাখা, শাসনকার্য চালান ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা—এসব কাজে লেখাপড়ার খুবই দরকার হয়। আজ থেকে দু'হাজার বছর বা তারও আগে মিশরের পুরোহিতরা প্রথম লিখতে শেখেন। প্রথম প্রথম মিশরীয়গণ নানা জিনিসের ছবি একে মনের ভাব প্রকাশ করত। পরে ছবিগুলি হুবহু না এঁকে ইঙ্গিতে তাদের বোঝান হতে থাকে। যেমন গাধার কান এঁকে বোঝান হত গাধাকে। পরে কোন জিনিসের নামের উচ্চারণ বোঝানোর জন্য এক ধরনের ছবি বা চিত্র আঁকা হতে লাগল। সবার শেষে ব্যবহার করা হল হরফ। অর্থাৎ ক, খ, গ, বোঝাতে এক ধরনের চিত্র আঁকা হতে লাগল। এরকম চব্বিশটি হরফ ব্যবহার করা হত লেখার জন্য। কিন্তু মিশর-বাসীরা শুধু হরফগুলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল না। শব্দের অর্থ যেমন কর্, খন্ প্রভৃতি বোঝাতেও তারা ছবি বা ঐ জাতীয় চিহ্ন ব্যবহার করতে থাকে। মিশরী হরফের একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। 'L' এই হরফটি বোঝান হত সিংহ এঁকে। এবার বুঝলে তো ব্যাপারটা। মিশরবাসীদের এই চিত্রলিপিকে বলা হত **হিয়েরোগ্লিফিক্স** বা পবিত্র লিপি। পুরোহিতগণ এই লিপি ব্যবহার করতেন বলেই হয়ত এর নাম হয় পবিত্রলিপি। এই লিপির অর্থ যে পণ্ডিত সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর নাম শাঁপলিয়। তাঁর বাড়ী ফ্রান্সে।



হিয়েরোগ্লিফিক্স

লিপিকার বা লেখক—সমাজে পুরোহিতদের পরেই স্থান ছিল লিপিকার বা লেখকদের। পুরোহিতরা মন্দিরগুলিতে স্কুল খুলে ছাত্রদের লেখাপড়া

শেখাতেন। এখানকার ছাত্ররাই পরে মন্দিরে ধনীলোক ও রাজার অধীনে লেখকের কাজ নিত। তারা হিসাব রাখত, খাতাপত্র, চিঠিচাপটি লিখত এবং কখনো কখনো পুঁথি-পুস্তক নকল করে রাখত। যে সব লোক আদালতে কাজ করত তাদের বেশ দু'পয়সা উপরি রোজগার হত। অর্থাৎ তারা ঘুষ



লিপিকার

খেত এর-ওর কাছ থাকে। পরিশ্রম তেমন নেই, অথচ আয় ভাল, সম্মানও খুব। কাজেই মিশরের সব তরুণই লেখক হতে চাইত। বর্তমানকালে এই লেখকদের কেরাণী বলা হয়ে থাকে। মিশরের লেখকগণ খুব শান্তিপ্রিয় ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ তাদের একদম ভাল লাগত না।

কর আদায়কারী—রাজা প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের দশ থেকে কুড়িভাগ খাজনা আদায় করতেন। খাজনা বা কর আদায় করার জন্য তিনি একদল কর্মচারী নিযুক্ত করেন। এদের বলা হত কর আদায়কারী। এরা কৃষকদের উপর খুব অত্যাচার করত। ভাল ফলন হোক আর না হোক, চাষীদের খাজনা দিতে হতই। কর আদায়কারীর হাতে থাকত একটা লাঠি আর সঙ্গে থাকত অনেক পাইক-পেয়াদা। কেউ খাজনা দিতে না পারলে

তাকে মাটিতে ফেলে লাঠিপেটা করা হত বা দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর জলে



কর না দেওয়ায় শাস্তি : হিসাবরত লিপিকার

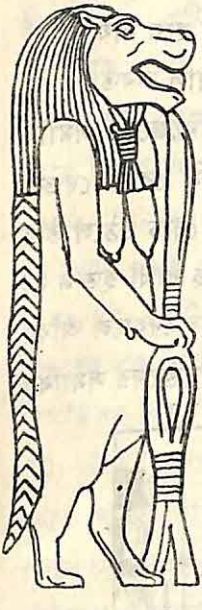
ডোবান হত। কর আদায়কারীদের আসতে দেখলেই গরীব চাষীরা অনেক সময় ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেত।

শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতি—যারা পরিশ্রম করে জীবন চালায় তাদের বলা হয় শ্রমিক। আর যারা জিনিসপত্র তৈরী করে তাদের নাম কারিগর। মিশরে শ্রমিক আর কারিগররা সাধারণতঃ রাজা ও বড় লোকদের অধীনে কাজকর্ম করত। চাষী ও পশুপালন ছাড়া মিশরে ছিল কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, মুচী, জহুরী, ভাস্কর (অর্থাৎ যারা পাথর কেটে মূর্তি বানায়), রাজমিস্ত্রী, মাঝিমাল্লা, ক্রীতদাস (অর্থাৎ যাদের যুদ্ধের সময় বন্দী করা হত বা অন্য দেশ থেকে কিনে আনা হত) ও চাকর-বাকর। অনেকে প্যাপিরস থেকে দড়ি, মাদুর, কাগজ ও নৌকাও তৈরী করত। মিশরীয় কারিগরদের কাজ খুব সূক্ষ্ম ছিল। কিন্তু তাদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। রাজা ও ধনীরা প্রায়ই তাদের বেগার বা বিনা মজুরীতে খাটাতেন। তাদের প্রায়ই পেট ভরে খেতে দেওয়া হত না; কাজের ফাঁকে যে তারা একটু জিরিয়ে নেবে তারও উপায় ছিল না। সারাক্ষণ পশুর মত কাজ না করলে তাদের কপালে ছিল কঠোর শাস্তি। রাজা ও ধনীরা অবশ্য কারিগরদের দরকারী যন্ত্রপাতি, পোষাক ও খাবারদাবার দিতেন। মিশরে শ্রমিকদের সৈন্য বলা হত।

প্রধান প্রধান জীবিকা—প্রাচীন মিশরীয়দের প্রধান জীবিকা ছিল চাষ-বাস, পশুপালন, পুরোহিতের কাজ এবং রাজা ও ধনী লোকদের অধীনে নানা ধরনের শ্রমিক ও কারিগরের চাকুরী।

ব্যবসা-বাণিজ্য—মিশরীয় বণিকরা সাধারণতঃ রাজার নির্দেশেই বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তবে দেশের মধ্যে ছোটখাট দোকানদারী তারা

নিজেরাই করত বলে মনে হয়। মিশরীয় বণিকগণ বিদেশ থেকে পিরামিড তৈরীর মালমশলা ও বিলাসদ্রব্য যোগাড় করত। আফ্রিকার নানা স্থান থেকে আনা হতহাতীর দাঁত, দামী পাথর, রঙ, সুগন্ধি দ্রব্য, সোনা, উটপাখীর পালক প্রভৃতি। এশিয়া থেকে আসত তামা, ব্রঞ্জ, কাঠ, মদ, মাছ, মশলা ইত্যাদি।



জলহস্তিনী দেবী

মিশর থেকে অন্য দেশে চালান যেত—কাগজ, কাপড়-চোপড়, সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র ও গহনাপত্র। মিশরীয়রা নিজেদের খুব সভ্য বলে মনে করত। অন্যদেশের লোকদের সম্পর্কে তাদের মোটেই ভাল ধারণা ছিল না। ফলে বিদেশের সঙ্গে মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন জমে ওঠেনি।

ধর্মীয় বিশ্বাস—মিশরীয়গণ হাজার হাজার দেব-দেবীর পূজা করত। নানা টোটেম যেমন জলহস্তী, কুমীর, শেয়াল, কুকুর, ছাগল. হাঁস, বাজপাখী, চড়ুই পাখী ও সাপ, দেবতা বলে গণ্য হত। টোটেম কাকে বলে তা আগেই বলা হয়েছে। এগুলি ছাড়া ছিলেন সূর্যদেবতা 'রা' ও হোরাস, জীবিতের বা মৃতের দেবতা অসিরিস, মৃত্যু বা আঁধারের দেবতা অ্যাপোপিস, সেট ও অ্যানুবিস। বিদ্যার দেবী থৎ, আকাশদেবী নুট, বায়ুদেবতা সু, পৃথিবীর দেবতা গেব, মাতৃ-দেবী আইসিসিবা হ্যাথর, আনন্দের দেবতা বেসও মিশরীয়দের উল্লেখযোগ্য দেবদেবী ছিলেন। মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর আত্মা বা 'কা' দেহ ছেড়ে দেবতাদের কাছে চলে যায়। দেবতারা আত্মার ভাল ও মন্দ কাজের বিচার করেন। ভাল আত্মা 'আ-লু' বা স্বর্গে যায় আর খারাপ আত্মার ঠাঁই হয় নরকে। ভাল আত্মা মৃতদেহে ফিরে আসে এবং নূতন জীবন যাপন করতে পারে। এজন্যই মিশরীয়রা মৃতদেহকে নষ্ট করে ফেলে না। নাড়ি-ভুঁড়ি, মগজ ইত্যাদি বার করে ফেলে শব দেহটিকে নানা ওষুধে ডুবিয়ে রাখা হয়। তারপর মৃতদেহটিকে কাপড়ে জড়িয়ে কাঠের

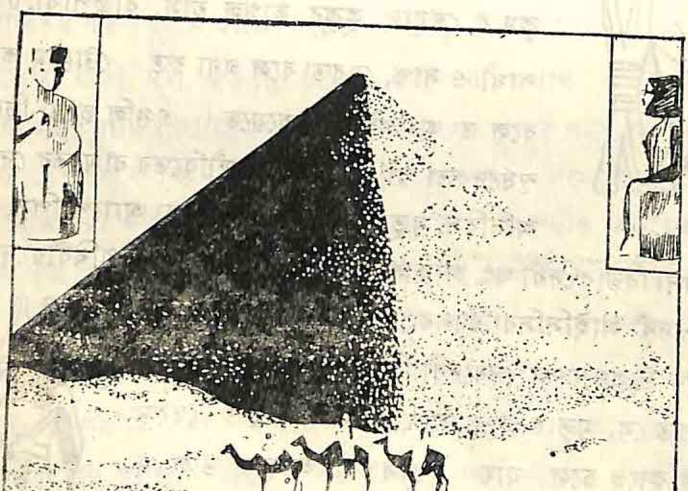


অ্যানুবিস

বাক্সে শুইয়ে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই মৃতদেহের তখন নাম হয় ম্যমি। নীলনদ বছরের অন্যসময় সরু হয়ে গেলেও গ্রীষ্মকালে ফুলে ফেঁপে ওঠে। সূর্য অস্ত যাবার পরেও সে পরের দিন আবার পূব আকাশে দেখা দেয়। এ থেকেই মিশরীয়রা কল্পনা করে যে, মানুষ মরে যাবার পরও আবার নূতন জীবন লাভ করবে। মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না।

মিশরীয়রা নানা অপদেবতা, যাদুমন্ত্র ও তুকতাকেও বিশ্বাস করত।

পিরামিড—রাজা-মহারাজারা তাঁদের জীবিতকালেই নিজেদের সমাধি তৈরী করে যেতেন। মৃত্যুর পর এই সমাধিতে তাঁদের ম্যমি রেখে দেওয়া হত। মাটির নীচে ঘর তৈরী করে ম্যমি রাখা হত। রাজা বেঁচে উঠলে তাঁর বহু জিনিসের প্রয়োজন হবে। তাই তার মামির কাছে রাখা হত ন না দরকারী জিনিস, এমনকি চাকর-বাকরের মূর্তি পর্যন্ত। ঘরের দেয়ালে আঁকা থাকত অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি। রাজা-মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিদের সমাধির



পিরামিড

উপর গড়ে তোলা হত বিরাট উঁচু পাথরের তিনকোণা স্তূপ। এর নাম পিরামিড। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই দিয়ে এই পিরামিড তৈরী করা হত। পাহাড় থেকে পাথর কাটা হত তামা বা ব্রঞ্জের যন্ত্রপাতি দিয়ে। অনেক দূর থেকে পাথর বয়ে এনে ক্রীতদাস ও শ্রমিকরা এগুলি তৈরী করত। পিরামিড

তৈরী করতে যে কতটা মাথা খাটাতে হয়েছে বা কী নিদারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এদের এই পরিশ্রম দেখে মনে হয়, মিশরীয়রা যেন ইহকাল থেকে পরকালকেই বেশী ভালবাসত।

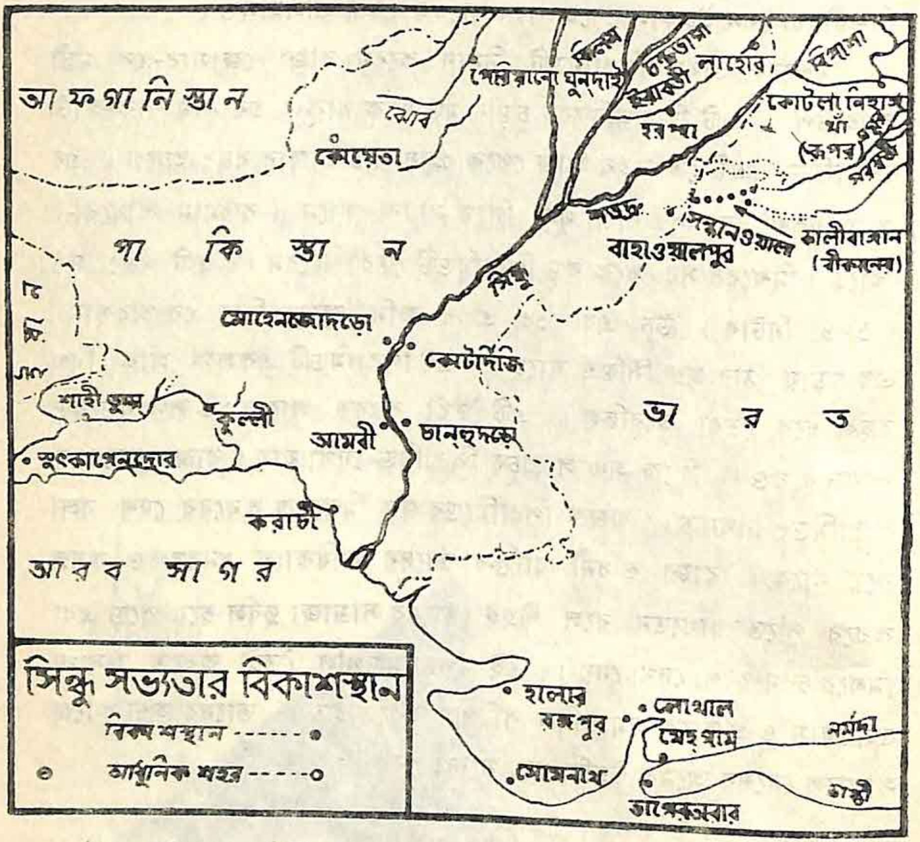
মিশরের প্রথম পিরামিডটি নির্মাণ করেন রাজা জোসার-এর মন্ত্রী ইম্‌হটেপ। এটি ছিল মন্দিরের চূড়ার মত থাক্ থাক্। এর নাম থাক্-কাটা পিরামিড। এটি তৈরী হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এর প্রায় একশ' বছর পর রাজা খুফু, গিজে নামক স্থানে (বর্তমান কায়রো-র কাছে) মিশরের সব থেকে বড় পিরামিডটি তৈরী করেন। এটি ৪৮১ ফুট (১৪৬ মিটার) উঁচু এবং ১৩ একর জমি জুড়ে ছিল এর অবস্থান। এর চূড়ায় ওঠার জন্য সিঁড়িও আছে। এই পিরামিডটি একলক্ষ লোক বিশ বছর ধরে তৈরী করেছিল। এটি তৈরী করতে লাগে ২৩ লক্ষ বড় বড় পাথরের খণ্ড। গিজে অঞ্চলে প্রচুর পিরামিড দেখা যায়। রাজা খুফরো-র পিরামিডও বিখ্যাত। অজস্র পিরামিডের জন্য মিশরকে কবরের দেশ বলা হয়ে থাকে। রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা তাঁদের অধিকাংশ ধনরত্ন ও ফসল কবরে পুঁতে রাখতেন বলে শীঘ্রই তাঁদের সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মিশরে চরম দুর্দশা দেখা দেয়। এই পিরামিডগুলি তৈরী করতে অসংখ্য ক্রীতদাস ও প্রজাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। তাদের অন্য কাজে লাগালে দেশের অনেক উন্নতি হত, সন্দেহ নেই।

(৩) সিন্ধু সভ্যতা

প্রাচীন পৃথিবী তাম্র-ব্রঞ্জ যুগেই নগর সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল। মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতার উদ্ভব ঘটে তাম্র-ব্রঞ্জ যুগেই। অবশ্য এই যুগে পাথরের ব্যবহারও কম ছিল না। কারণ তামা ও ব্রঞ্জের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তামা-ব্রঞ্জ ও পাথর একই সঙ্গে ব্যবহার করা হত বলে এ যুগের সভ্যতাকে তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই ধরনেরই একটি অতি উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সিন্ধুনদ ও তার শাখানদীগুলির তীরে তীরে। বেলুচিস্তানেও

এই সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা বলে পরিচিত। এটি ছিল নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা। অর্থাৎ নগর বা শহরকে কেন্দ্র



সিন্ধু সভ্যতার বিকাশস্থান

করেই এর বিকাশ ঘটেছিল। আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এই সভ্যতার সৃষ্টি হয়। আগে আমাদের ধারণা ছিল, আর্যদের বৈদিক সভ্যতাই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা। বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে আমরা বুঝতে পেরেছি, বৈদিক সভ্যতার আরও দু'হাজার বছর আগে ভারতে এক সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল। এর ফলেই প্রমাণিত হয়েছে, ভারতের সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম।

সিন্ধু সভ্যতার দুটি প্রধান কেন্দ্র,—মোহেনজোদড়ো ও হরপ্পা। মোহেনজোদড়ো সিন্ধুদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত।

পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলায় ইরাবতী নদীর ধারে হরপ্পার অবস্থান। এই তুটি স্থানের উঁচু ঢিপি খুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তু'টি বিশাল নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার নাম অনুসারে সিন্ধু সভ্যতাকে মোহেনজোদরো ও হরপ্পা সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে।

মোহেনজোদড়ো নগর যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নাম **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**। মোহনজোদরো একটা ঢিবির নাম; এর অর্থ মৃতের স্তূপ। স্থানীয় লোকেরা ঢিবিটির এই নাম দিয়েছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস জঙ্গলে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মোহেনজোদড়োতে এসে হাজির হন। তিনি এখানে চক্‌মকি পাথরের একটি ছুরি খুঁজে পান। এ থেকেই তিনি বুঝতে পারেন, এই স্থানটি অতি প্রাচীন পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই স্তূপ খুঁড়ে নরম পাথরের কয়েকটি শীললোহর ও অন্যান্য জিনিস আবিষ্কার করেন। শীলমোহরগুলিতে কিছু ছবি বা চিত্রলিপি ছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে **দয়ারাম সাহনী** হরপ্পার মাটি খুঁড়ে ঠিক এই ধরনেরই কিছু জিনিস পেয়েছিলেন। রাখালদাস তাঁর আবিষ্কৃত সামান্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করেই ঘোষণা করলেন যে, মোহেনজোদড়োর সভ্যতা তুই তিন হাজার বছর আগেকার সভ্যতা। এইভাবে পৃথিবীর লোক মোহেনজোদড়ো ও হরপ্পার অতি প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারল। শীঘ্রই জানা গেল যে, এই তুই স্থানের সভ্যতা হুবহু একই র কমের এবং খুবই প্রাচীন। পরবর্তীকালে আরও অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এদের মধ্যে সার জন মার্শাল, মর্টিমার হুইলার প্রভৃতি বিখ্যাত। মোহেনজোদড়ো ও হরপ্পার মত নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের আমরি, ঝুকর, ঝাঙর, চানহুদড়ো, কোটদিজি ও শাহীতুম্পে পাওয়া গেছে। পাঞ্জাবের কোটলানিহাঙ্গ সন্ধানওয়ালা, গুজরাটের রংপুর ও লোথালে, রাজস্থান ও বিকানীরে এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীর উপত্যকা অঞ্চলেও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

কোন লিখিত ইতিহাস থেকে সিন্ধুসভ্যতার বিবরণ জানা যায় নি। মাটি খুঁড়ে এ সভ্যতার যে ভাঙা-চোরা ঘরবাড়ী ও জিনিসপত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। তা থেকেই এ সভ্যতা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা হয়েছে।

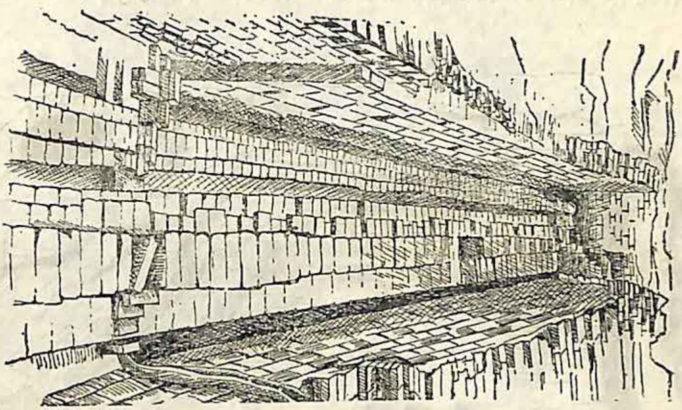
এখানে চিত্রলিপিযুক্ত বহু শীলমোহর পাওয়া গেলেও সেগুলি পড়া সম্ভব হয়নি।

মোট চারটি জাতির লোক সিন্ধু উপত্যকায় বাস করত বলে জানা গেছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন, প্রধানতঃ দ্রাবিড় জাতিই এই সভ্যতার স্রষ্টা। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারকারী লোকদের সঙ্গে এদের মিল আছে।

নগর পরিকল্পনা—মোহেনজোদড়ো ও হরপ্পার নগর দু'টি পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছিল। বন্যার ফলে এই নগরগুলি বার বার নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা একই জায়গায় এই শহরগুলি বার বার নতুন করে নির্মাণ করে। উভয় স্থানে শহরের সাতটি করে স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি স্তরে একই পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরগুলি বানানো হয়েছিল। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সব একই রকমের। এমন কি বিভিন্ন স্তরে যে সকল জিনিস পাওয়া গেছে সেগুলিও একই ধরনের। উভয় শহরেরই পশ্চিম দিকে ছিল নগর রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত বিরাট দুর্গ। দুর্গের কাছাকাছি ছিল শস্যাগার ও বড় বড় বাড়ীগুলি। শহরের চারদিকে উঁচু দেওয়াল ছিল। পোড়ামাটির গুটিকা ও রোদে শুকানো ইট দিয়ে বাড়ীগুলির ভিত তৈরী হত। প্রায়ই বন্যা হত বলে ভিত খুব উঁচু করে তৈরী হত। বাড়ীগুলি ছিল পোড়ান ইট দিয়ে তৈরী। এগুলির মেঝে ছিল পাকা। বাড়ীগুলি একতলা, দোতলা বা তার চেয়েও উঁচু হত। ছোট বাড়ীগুলিতে দু' কামরা এবং বড় বাড়ীতে বহু কামরা থাকত। প্রত্যেক বাড়ীর চারদিকে ছিল দেওয়াল। প্রতিটি বাড়ীতে উঠোন, স্নানঘর, খাটা পায়খানা, কুয়ো ও নর্দমা ছিল। ঘরগুলির ছাদ ছিল সমতল। ঘরে উপযুক্ত দরজা-জানালাও ছিল। তবে সদর রাস্তা থেকে বাড়ীতে ঢোকা যেত না। পাশের গলি থেকে বাড়ীতে ঢোকার জন্য দরজা ছিল। দোতলা, তেতলা বাড়ীতে সিঁড়ি ছিল ওপরে ওঠার জন্য। ধনীদের বাড়ীগুলি ছিল বড় বড় রাস্তার ধারে। ছোট ছোট বাড়ীগুলি ছিল গলিতে।

শহরের বড় বড় রাস্তাগুলি উত্তর-দক্ষিণে ও পূব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। এগুলি ছিল সোজা ও চওড়া। ৯ ফুট (২'৭৩ মিটার) থেকে ৩৪ ফুট

(১০ ৩১ মিঃ) পর্যন্ত চওড়া হত রাস্তাগুলি। এক রাস্তা অন্য রাস্তাকে ছেদ করে চলে যেত। শহরগুলি কয়েকটি অংশে বিভক্ত ছিল। শহরগুলিতে

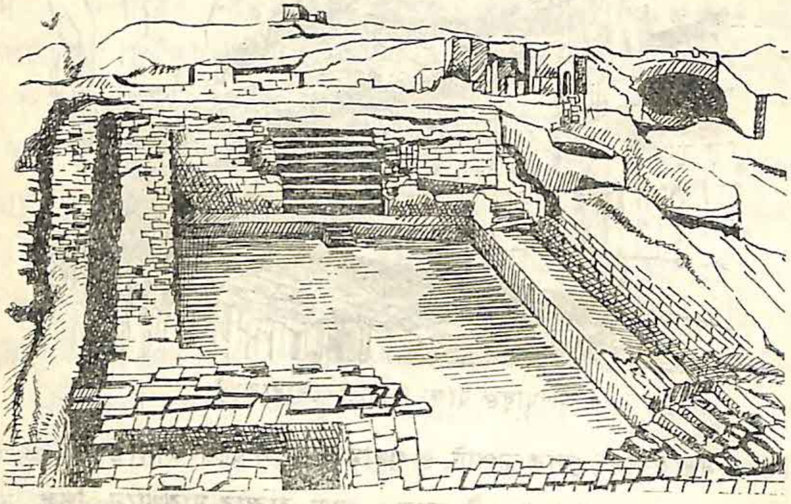


নর্দমাযুক্ত রাস্তা (মোহেনজোদড়ো)

বাগান, সরাইখানা, দোকানপাট ও গুদামঘর ছিল বলে জানা গেছে। রাস্তায় চাকাওলা গরু ও মোষের গাড়ী চলত। বড় রাস্তার মাঝখানে ছিল ঢাকা পাকা নর্দমা। বাড়ীর নর্দমাগুলির সঙ্গে এর যোগ ছিল। এই নর্দমাগুলি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হত। শহরের আবর্জনা বাইরে ফেলে দেবার ব্যবস্থা ছিল। শহর ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাতে রাস্তায় আলো দেবার ব্যবস্থা ছিল। পাহারাদাররা পাহারা দিত রাস্তা ও নগরের নানা অংশ। বড় রাস্তা থেকে গলি বেরত। প্রতি গলিতে কুয়ো ছিল।

মোহেনজোদড়ো ও হরপ্পায় বিশাল শস্যাগার ছিল। প্রজারা শাসক বা রাজাকে কর হিসাবে শস্য দিত। এই শস্য রাখা হত এখানে। হরপ্পায় শস্যাগারের কাছে শ্রমিকদের একটী বস্তী ছিল। এরা শস্য পেষাই করত। মোহেনজোদড়োতে কয়েকটি বড় বড় বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বড় বড় থামওয়ালা একটি ঘর ও বিরাট স্নানাগার উল্লেখ-যোগ্য। স্নানাগারটি লম্বা ও চওড়ায় ১৮০ ফুট (৫৫ মিটার) ও ১০৮ ফুট (৩৩ মিটার)। এতে ছয়টি প্রবেশদ্বার, অনেক ঘর, বারান্দা ও বসার গ্যালারি ছিল। স্নানের জন্য এখানে যে চৌবাচ্চাটি ছিল তা লম্বায় ৩৯ ফুট

(১২ মিঃ) চওড়ায় ২৩ ফুট (প্রায় ৭ মিঃ) এবং গভীরতায় ৮ ফুট (প্রায় ২.৪ মিঃ)। এতে জলসরবরাহ ও জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত ছিল। জনসাধারণের স্নান বা ধর্মকর্মের জন্য এটি ব্যবহার করা হত।



স্নানাগার (মোহেনজোদড়ো)

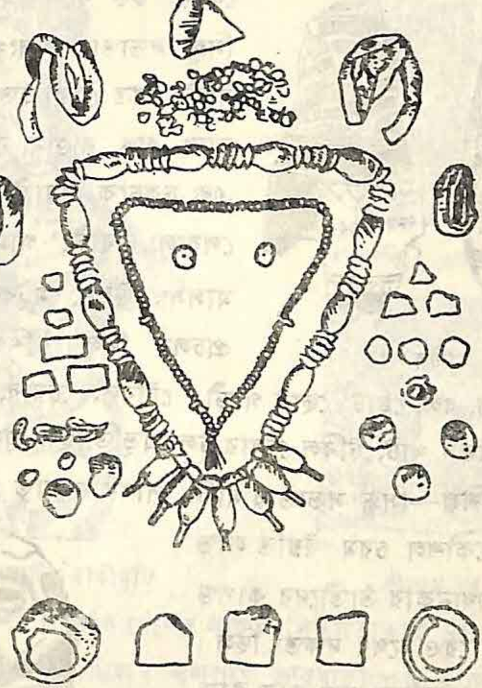
খাদ্য—নাগরিকদের জীবন খুব সুখের ছিল। তাদের অবস্থা ছিল সচ্ছল। গম, যব, চাল, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, তিল, রাই, দুধ, খেজুর, তরমুজ,



শস্যাগার

প্রভৃতি ফল ও নানাপ্রকারের শাকসব্জী তাদের প্রধান খাদ্য ছিল।

পোশাক ও গহনাপত্র—কার্পাস তুলা থেকে প্রস্তুত কাপড় ও কিছু কিছু পশমীবস্ত্র নাগরিকগণ ব্যবহার করত। স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেকে দুখণ্ড করে



গহনাপত্র

কাপড় পরত। উভয়েই মূল্যবান পাথর, রূপা, তামা, ব্রঞ্জ, হাতীর দাঁত, শাঁখ প্রভৃতি দিয়ে তৈরী গহনা পরতে ভালবাসত। গহনার মধ্যে হার, দুল, চুড়ি, চূড়, আংটি, মল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য—এ যুগের লোক সোনা, রূপা, তামা, ব্রঞ্জ, সীসা, পাথর ও মাটির তৈরী নানা জিনিস ব্যবহার করত বলে জানা গেছে। লোহার ব্যবহার তারা জানত না। সোনা-রূপা দিয়ে সাধারণতঃ গহনা ও পাত্র তৈরী হত। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে তামা ও ব্রঞ্জ-এর তৈরী বর্শা, ছুরি, কুড়ুল, তলোয়ার, বাটালি ও তীরের ফলা। ক্ষুর, করাত, বঁড়শি, কাস্তে, ছেঁদা করার যন্ত্র, ছুঁচ, আয়না, চিরুনি, নানা প্রকারের পাত্র, বাসন-কোসন প্রভৃতিও পাওয়া গেছে। সীসার কিছু পাত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। পাথর দিয়ে

নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র, হাতিয়ার, বাটখারা, শীলমোহর প্রভৃতি তৈরী হত। শীলমোহনগুলি দিয়ে জিনিসপত্রে ছাপ দেওয়া হত বলে অনুমান করা হয়। সিন্ধু সভ্যতায় অসংখ্য উন্নত ধরনের মাটির পাত্র তৈরী হত। এগুলো ছিল নানা রঙে রাঙান, নক্সা ও ছবি আঁকা এবং চকচকে। মাটির থালা, গেলাস, পেয়ালা, বাটী, গামলা, ভাঁড়, হাতা, মালসা, উনুন, মট্‌কী প্রভৃতির খুব প্রচলন ছিল। শিশুরা পোড়ামাটির পুতুল, মার্বেল, বল, ছোট ছোট গাড়ী, টেবিল, চেয়ার, টুল প্রভৃতি নিয়ে খেলাধূলা করত। খাট,টেবিল চেয়ার,টুল প্রভৃতি ছিল প্রধান আসবাবপত্র।



চিত্রিত মাটির পাত্র

বিভিন্ন শিল্প—সিন্ধু সভ্যতায় মাটি, পাথর ও ধাতু দিয়ে জিনিসপত্র তৈরী করার কৌশল চরম উন্নতি লাভ করেছিল। এখানকার তাঁতীদের কাপড় বোনার ব্যাপারেও যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। এই অঞ্চলের স্বর্ণকাররা সূক্ষ্ম কারু কাজ করা চমৎকার সব অলংকার তৈরী করত। চিত্র অঙ্কন, শীলমোহরে চিত্র-লিপি খোদাই করা এবং পাথরের মূর্তি নির্মাণ বা ভাস্কর্যেরও বেশ উন্নতি হয়। এখানকার ইঞ্জিনিয়ার বা স্থপতি এবং রাজমিস্ত্রীরাও খুবই দক্ষ ছিল। নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।



প্রস্তর মূর্তি মোহেনজোদড়ো)

ব্যবসা-বাণিজ্য—পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই নগরগুলির শাসন-কর্তারা ছিলেন বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। নগরের অধিকাংশ ধনী লোকই হয়ত

ব্যবসাদার ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল, আফগানিস্তান, পারস্য, তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে মূল্যবান ধাতু, কাঠ, শাঁখ, প্রভৃতি আনা হত।





পশুপতি (মোহেনজোদড়ো



পোড়ামাটির নারীমূর্তি

শীলমোহর

মেসোপটেমিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের সহিত সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলির স্থল ও জলপথে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। স্থলপথে ভারবাহী পশু, চাকাওলা গাড়ী ও জলপথে নৌকা ও জাহাজ ব্যবহার করা হত। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম ছিল বিনিময় প্রথা। নগরগুলিতে কয়েকটি চৌকোণা তামার ফলক পাওয়া গেছে। এগুলিকে মুদ্রা বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে প্রাচীনকালে বোধ হয় কয়েকটি বৃহৎ বন্দর ছিল। নানা দেশের লোক এগুলিতে এসে ভিড় জমাত। এ দেশের সূতী বস্ত্র, মাটির পাত্র, মাহুলি ও বিলাস-দ্রব্যের বেশ চাহিদা ছিল বিদেশে। বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হত বলেই বোধ হয় এই সভ্যতা এত উন্নত ছিল। অবশ্য চাষবাসের ফলেও প্রচুর বাড়তি ফসল উৎপন্ন হত। নইলে এত বড় নগর দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকতে পারত না।

ধর্ম—সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা দেবী বা মহামাতার খুব ভক্ত ছিল। ইনি হয়ত বর্তমানকালের দুর্গা, কালী বা পার্বতী। এই দেবীর বহু মূর্তি

পাওয়া গেছে। এঁর কাছে মানুষ ও ছাগল বলি দেওয়া হত। শিবের মত এক দেবতাও তখন পূজা পেতেন। এঁর তিনটি মুখ, মাথায় তিনটি শিঙ, এবং তিনি বসে আছেন যোগীর মত। তাঁর চারপাশে বাঘ, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি পশুর দল। ইনি বর্তমানকালের পশুপতি শিব। শিবলিঙ্গের পূজাও এইসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। ষাঁড়, বাঘ, গণ্ডার, হাতী, কুমির প্রভৃতিরও পূজা করা হত। সম্ভবতঃ এই সভ্যতায় ঘোড়ার চলন ছিল না। অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ষাঁড় এরকম কাল্পনিক প্রাণীরও পূজার চল ছিল। এগুলি ছাড়া, গাছ, পাথর, সাপ, পাখী, আগুন, জল ও সূর্যের পূজা করা হত। সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলিতে কোন মন্দির ছিল কিনা বলা কঠিন। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা জন্মান্তরেও বিশ্বাসী ছিল।

সমাজের নানা শ্রেণী—সিন্ধু সভ্যতার জনগণ প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল :—১। ধনী ও ২। গরীব। ধনীদের মধ্যে ছিল শাসকবর্গ, পুরোহিত ও বণিক সম্প্রদায়। চাষী, ছোট দোকানদার, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, রাজমিস্ত্রী, চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতি কারিগর, সাধারণ শ্রমিক ও চাকর-বাকররা ছিল গরীব শ্রেণীতে। তবে গরীব শ্রেণীর লোকেরাও বোহহয় খুব গরীব ছিল না। কারণ কুলিদের ঘর থেকেও কিছু সোনা-দানা পাওয়া গেছে। চাষী, দোকানদার ও কারিগররা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল কিনা, জানা যায় না।

সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলিতে নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা হত। জলনিকাশেরও সুবন্দোবস্ত ছিল। প্রাচীন পৃথিবীর আর কোথাও এরকমটি দেখা যায় না। ভারতের বর্তমান হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

পতনের কারণ—এই উন্নত সভ্যতার পতন ঘটে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। সিন্ধুনদের বন্যা, মহামারী, বৃষ্টিপাতের অভাব, চাষবাসের অসুবিধা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে এই সভ্যতার পতন শুরু হয়। হয়ত নানা কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যেও তখন তেমন লাভ হচ্ছিল না। এই অবস্থায় লোহার অস্ত্র ব্যবহারকারী বর্বর আর্যজাতির আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।

(৪) প্রাচীন চীন

চীনের সভ্যতাও বেশ প্রাচীন। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলির মত এটিও নদী উপত্যকায় গড়ে উঠেছে। চীনের দুই বিখ্যাত নদী হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং। এরা এক বিরাট সমতল ভূমির উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে পীত সাগরে পড়েছে। এই সমতল ভূমিতেই গড়ে উঠেছে চীনের প্রাচীনতম সভ্যতা

এশিয়ার পূর্ব দিকে চীনের অবস্থান। এই বিশাল দেশটি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মাথার ওপরে।

হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং নদীতে প্রায়ই বন্য হয়। তবে হোয়াং-হো নদীর বন্যাতেই চীনের সব থেকে বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে। বৃষ্টির জলে এই নদী ফুলে ফেঁপে দুই কূল ভাসিয়ে দেয়। এর বন্যায় চাষের জমি নষ্ট হয়, অজস্র বাড়ীঘর ভেঙে যায়, মানুষের দুঃখের আর অন্ত থাকে না। এজন্য হোয়াং-হো নদীকে বলা হয় **'চীনের দুঃখ'**। এই নদীর জলে প্রচুর কাদামাটি থাকে বলে এর খাত মোটেই গভীর নয়। কাদামাটি জমে চড়া পড়ে যায় বলে এই নদী প্রায়ই চলার পথ পাল্টে নেয়। এর ফলেও চাষের জমি ও বাড়ীঘরের খুব ক্ষতি হয়। হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং নদী দুটির বন্যার পর মাটিতে ঘন হয়ে এঁটেল পলি জমে। এই পলিমাটি খুবই উর্বরা। এতে প্রচুর ফসল ফলে। তাই এই উর্বর অঞ্চলে ঘন লোকবসতি গড়ে ওঠে, ধীরে ধীরে বিকশিত হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং বিধৌত সমভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভালই হয়; এখানে খনিজ দ্রব্যও কম পাওয়া যায় না, মাটিও উর্বর। তাই এখানকার অধিবাসীরা যে খুবই উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলবে, তাতে আর অবাক হবার কি আছে ?

চীনাদের ধারণা, বেশ কয়েক লাখ বছর আগে চীনে মানব-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ ধারণা ঠিক না হলেও অন্ততঃ তিন-চার হাজার বছর আগে এদেশে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। দেশী-বিদেশী নানা জাতির লোক মিলে চীনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে।

চীনা পুরাণের মতে, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর নাম পান-কু। এ কাজে তাঁর দীর্ঘ আঠার হাজার বছর লেগেছিল। তাঁর সঙ্গী ছিল ড্র্যাগন, কচ্ছপ প্রভৃতি। ড্র্যাগন কিছুটা কুমির, কিছুটা সাপের মত। বন্যার সময় ভয়ংকর দেখতে হোয়াং-হো নদী থেকেই বোধ হয় ড্র্যাগনের কল্পনা করা হয়েছিল। ড্র্যাগন ও কচ্ছপ জীবজন্তুর আদি পুরুষ। পান-কু মারা গেলে তাঁর গায়ের পোকা থেকে সৃষ্টি হল মানুষ।

পান-কু-র পর স্বর্গের সম্রাটগণ, পৃথিবীর সম্রাটগণ এবং মানব সম্রাটগণ চুয়ান্ন হাজার বছর ধরে চীনে রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের পর আরও অনেক সম্রাট চীনে রাজত্ব করেন। তাঁদের সময় চীনারা ঘরবাড়ী বানাতে, আগুন জ্বালতে ও রান্না করতে শেখে।

এরপর চীনে রাজত্ব করেন পাঁচজন বিখ্যাত সম্রাট। তাঁদের রাজত্বকালে চীনারা লোহার ব্যবহার, পশুপালন, মাছধরা, চিত্রলিপি অঙ্কন প্রভৃতি শেখে। লাঙল দিয়ে চাষবাস, চাকাওলা গাড়ী, রেশমের পোশাক, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুশাসনের প্রচলনও এই সময়েই হয়েছিল। সম্রাট ফু-সি চীনাদের গণনা করে ভবিষ্যৎ জানতে ও দেবতার পূজা করতেও শিখিয়েছিলেন। এই পাঁচজন সম্রাট আন্দাজ পাঁচ-ছ' হাজার বছর আগে চীনে রাজত্ব করতেন।

এই সম্রাটগণের একজনের নাম ছিল শুন। তাঁর রাজত্বকালে একবার হোয়াং-হো নদীতে ভীষণ বন্যা হয়। বন্যার জল প্রায় আকাশ সমান উঁচু হয়ে ওঠে। এই জল মাটির উপর বহু দিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকায় চীনাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। বন্যায় অসংখ্য ঘরবাড়ী, লোকজন ও পশু মারা গিয়েছিল। যারা বেঁচে রইল কোন মতে, খাবার-দাবারের অভাবে তারাও মরতে লাগল কাতারে কাতারে। সম্রাটের কোন মন্ত্রী বা ইঞ্জিনীয়ারই এই বন্যার জল সরাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত সম্রাট শুন ইঞ্জিনীয়ার কুন-এর পুত্র য়ু-কে বন্যার জল সরাবার ও হোয়াং-হোকে বয়ে আনার ভার দিলেন। য়ু দীর্ঘ নয় বছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে এই কাজ সম্পন্ন করেন। য়ু-র বাবা কুন পাঁচিল তুলে ও বাঁধ দিয়ে বন্যার জল আটকাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হোয়াং-হো-র জল এগুলি ভেঙে বইতে থাকে। য়ু মাটি কেটে নদীর খাত

গভীর করেন এবং তার দুই তীরে মাটি,পাথর ইত্যাদি ফেলে বেশ উঁচু করে দেন। হোয়াং হো ও তার শাখা নদীগুলির মুখ পরিষ্কার করে দেওয়ায় সেগুলির জল সহজেই সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। নদী থেকে বহু খাল কেটে তিনি বাড়তি জল শুকনো জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন। হ্রদ কেটে বন্যার বাড়তি জল ধরে রাখারও ব্যবস্থা হল। এর ফলে বন্যার জল কমে গেল এবং চাষবাসেরও যথেষ্ট সুবিধা হল য়ু হোয়াং-হো-র চলার পথে বাধা সৃষ্টি না করে তার জলনিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এর ফলে চীনারা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায়। চীনারা এখনও বলে, য়ু না থাকলে আমরা সকলে মাছ হয়ে যেতাম। অর্থাৎ বন্যার ফলে সকলে মরে গিয়ে মাছ হয়ে জন্মাত। এই বিরাট কীর্তির জন্য শুনের পর য়ু-কে চীনের সম্রাট করা হয়েছিল। সম্রাট য়ু চীনে শিয়া বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ পাঁচশ বছর ধরে চীনে রাজত্ব করে। তারপর চীনে স্থাপিত হল শাং বংশ। শাং বংশের রাজাদের কথা পরে বলব।

(৫) নদীতীরে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলির সাদৃশ্য

এতক্ষণ যা বলা হল, তা থেকে বোধ হয় তোমরা একটা জিনিস বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছ। সেটি হল পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি বড় বড় নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতাগুলি হল, মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু ও চীনের সভ্যতা। নদীতীরে গড়ে ওঠা এই সভ্যতাগুলির মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য বা মিল দেখা যায়ঃ (১) যে সকল নদীর তীরে এই সকল সভ্যতা গড়ে ওঠে, সে নদীগুলিতে প্রতি বছরই বন্যা হত। বন্যার জলে বিরাট অঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় জমিতে পলি-মাটির স্তর পড়ত। এর ফলে জমি খুবই উর্বরা হয়ে উঠত। উর্বরা জমিতে প্রচুর ফসল ফলত বলে বহু লোক স্থায়ী ভাবে এখানে বসবাস করতে শুরু করে। তারা এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে জমি সাফ করে, অতিরিক্ত জল বার করে দেয় এবং জমির রস ফুরিয়ে গেলে নদী থেকে খাল কেটে এনে জলসেচের ব্যবস্থা করে। বহু লোক একসঙ্গে মিলেমিশে থাকত ও কাজ করত বলে ধীরে ধীরে সমাজ গড়ে উঠল। (২)এই

সকল জমিতে প্রয়োজনের বেশী ফসল ফলত বলে এ অঞ্চলের লোকেরা বেশ সচ্ছল জীবন যাপন করত। তারা কিছু অবসরও পেত। কারণ ঘরে খাবার জমা থাকায় তাদের সব সময় পরিশ্রম না করলেও চলত। অবসর সময়ে এরা নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা করে। এই ভাবেই তাদের সভ্যতার উন্নতি ঘটে।

(৩) স্থায়ী বাসিন্দাদের উন্নত জীবনযাত্রা দেখে শক্ত সমর্থ যাযাবর ও অসভ্য জাতিদের খুব হিংসে হয়। তারা দলে দলে সভ্যতার কেন্দ্রগুলি বার বার আক্রমণ করতে থাকে।

(৪) এই সভ্যতাগুলি মরুভূমি বা শুষ্ক অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। কারণ শুষ্ক জমিতে বেশী বন জঙ্গল থাকত না। সুতরাং জমি সাফ করবার পরিশ্রমও কম ছিল। সেই আদি যুগে ঘন বন-জঙ্গল পরিষ্কার করার মত যন্ত্রপাতি মানুষের হাতে ছিল না। মরু অঞ্চলে মানুষ ও বুনো পশুর আক্রমণও কিছু কম হত বলে মনে হয়।

(৫) বাড়তি ফসল ফলত বলে কারিগর, শিল্পী, বণিক, পুরোহিত প্রভৃতিকে পোষা সম্ভবপর হয়। এরা চাষবাস করত না। চাষীদের বাড়তি ফসল খেয়েই এরা জীবন ধারণ করত। বিনিময়ে তারা চাষীদের ধাতুর যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, অন্যান্য জিনিসপত্র, বিলাসদ্রব্য, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি যোগান দিত।

(৬) নদীর পলিমাটি দিয়ে ইট তৈরী করে পাকা বাড়ীঘর বানানো হতে লাগল। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হল গ্রামগুলিকে। এইভাবে সৃষ্টি হল নগর। ধাতু-শিল্পী ও বণিকরা নগরগুলিকে উন্নত করে তুলল নানা ভাবে। ধাতুর যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে পাওয়া গেল কাঁচামাল, খাদ্য ও বিলাসদ্রব্য বণিকরা নানা দেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্বদেশে নিয়ে এল নিজের দেশের বাড়তি জিনিসের বদলে।

(৭) তামা বা ব্রঞ্জের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষবাস, শিল্পকর্ম ও যুদ্ধ অনেক ভালভাবে করা সম্ভব হল।

(৮) নদীতীরে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলিতে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র স্থাপিত হল; গড়ে উঠল শাসন ব্যবস্থা। কোথাও রাজা, কোন স্থানে পুরোহিত, কোথাও বা ধনী বণিক—এঁরাই হলেন রাষ্ট্রের শাসক। তারা দেশের বাড়তি ফসল কর বা খাজনা হিসাবে চাষীদের কাছ থেকে নিয়ে নি:লেন। মূল্যবান ধাতুর যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রেরও মালিক হলেন তারাই। কারিগর ও শিল্পীরা তাঁদের অধীনে কাজ করতে লাগল। কারণ ঐ সব যন্ত্রপাতি যোগাড় করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এইভাবে কারিগররা তাদের স্বাধীনতা হারাল। যন্ত্রপাতি ও দু'মুঠো খাবারের বিনিময়ে তাদের সারাদিন পরিশ্রম করতে হত। তাদের পরিশ্রমের সুফল ভোগ করত মালিক শ্রেণী। এইভাবে সভ্যতাগুলিতে মালিক ও শ্রমিক দেখা দিল। সাম্রাজ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও দেখা মিলল। নগরগুলিতে নানা শ্রেণীর দক্ষ কারিগরেরও আবির্ভাব ঘটল।

(৯) ধাতুর অস্ত্রশস্ত্রের মালিক শাসকগণ সহজেই অন্য দেশ দখল করে রাজ্যবিস্তার করতে লাগলেন। এইভাবে বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হল। কাঁচামাল অর্থাৎ তামা, ব্রঞ্জ, সোনা, রূপা প্রভৃতি, ধাতু, কাঠ, পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্যও তাঁরা যুদ্ধ করতেন। অন্য দেশ লুঠ করে স্বাদেশে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসায় সেটি খুবই সচ্ছল হয়ে ওঠে। জনগণের অবস্থা ভাল হয়। তারা যন্ত্রপাতি ও বিলাসদ্রব্য কিনতে পারে। এর ফলে ঐ সব জিনিসও বেশী পরিমাণে তৈরী হতে থাকে।

(১০) অসভ্য বা আধা-সভ্য জাতিগুলির মধ্যে ধাতুর যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও বিলাসদ্রব্য বেচার জন্য চেষ্টা চলতে লাগল। এভাবেই বিস্তার ঘটতে থাকে সভ্যতার। পরে এই অসভ্য জাতিগুলিই সভ্য লোকের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে সভ্যতার কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল।

(১১) নদীতীরে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। প্রধানতঃ নদীপথেই এই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এই সভ্যতাগুলিকে ধাতু, কাঠ, পাথর প্রভৃতি কাঁচা মালের জন্য অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হত।

(১২) নদীতীরের সভ্যতাগুলি ধাতুর ব্যবহার আবিষ্কার করে, চাকাওলা গাড়ী ও নৌকা ব্যবহার করে, কুমোরের চাকা বানিয়ে, ইট তৈরী ও লিখতে শিখে এক লাফে অনেক দূর এগিয়ে যায়। এইভাবে শুরু হল মানুষের জয়যাত্রা।

অনুশীলনী

১। মেসোপটেমিয়া কোথায় অবস্থিত ছিল? এই অঞ্চলে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা কেন গড়ে উঠেছিল?

২। মেসোপটেমিয়া কথাটির অর্থ কি? এদেশের দুটি নদীর নাম লেখ।

৩। মেসোপটেমিয়ার মাটি কেমন? বন্যা আটকাবার জন্য এখানে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

৪। মেসোপটেমিয়ার লোকেরা কি কি বৃত্তি গ্রহণ করত?

৫। জিগ্‌গুরাট কি? এটি কি দিয়ে তৈরী?

৬। মেসোপটেমিয়ার ধাতুবিদ্যা সম্পর্কে কি জান?

৭। সুমের-এর লিখনরীতি সম্বন্ধে লেখ।

৮। এক কথায় উত্তর দাও:—

(ক) সুমেরীয়দের গাড়ী কে টেনে নিয়ে যেত?

(খ) মেসোপটেমিয়ার লোকেরা কোন্ ধাতুর ব্যবহার জানত?

(গ) সুমের-এর লিখনরীতির নাম কি?

৯। মিশর দেশটি কোথায়? 'ফ্যারো' কথাটির অর্থ কি? তাঁদের কিরূপ ক্ষমতা ছিল?

১০। মিশরের পুরোহিতরা কি কাজ করতেন?

১১। মিশরের চিত্রলিপি সম্পর্কে কি জান?

১২। মিশরীয় কর সংগ্রহকারীরা কেমন লোক ছিল?

১৩। মিশরীয় সমাজে লেখকদের কিরূপ স্থান ছিল?

১৪। পিরামিড কি? মিশরের প্রথম পিরামিডটি কে তৈরী করেন? পিরামিড কেমন দেখতে? পিরামিড তৈরী করার কারণ কি?

১৫। শুদ্ধ উত্তরটি খাতায় লেখ:—

(ক) মিশরকে নীল / সিন্ধু / টাইগ্রিস নদের দান বলা হয়।

(খ) মিশরে / সুমেরে পুরোহিতরা প্রথমে রাজা হন।

(গ) মিশরে লিখনরীতি আবিষ্কার করেন রাজা/ করসংগ্রহকারী / পুরোহিতগণ।

১৬। মিশরের দুজন দেবদেবীর নাম লেখ। মিশরীয়রা মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা সম্পর্কে কি ভাবত?

১৭। মোহেনজোদড়ো কথাটির অর্থ কি? সিন্ধুসভ্যতা কাকে বলে? এটি কোন্ যুগের সভ্যতা?

১৮। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে? এখানকার নগর ও বাড়াঘর কি দিয়ে তৈরী হত? এখানে জল নিকাশের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা ছিল?

১৯। সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা কি খেত ও পরত, লেখ। তাদের ব্যবহার করা কয়েকটি জিনিসের নাম লেখ।

২০। সিন্ধ্যুসভ্যতার লোকেরা কোন্ কোন্ দেবদেবী বা বস্তুর পূজা করত? সিন্ধু সভ্যতায় কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক ছিল?

২১। হোয়াং হো নদীকে চীনের দুঃখ বলা হয় কেন? কে এই নদীর বন্যা আটকাবার ব্যবস্থা করেন? তিনি কিভাবে এই কাজ করেন?

২২। চীনের সভ্যতা কোন্ অঞ্চলে গড়ে ওঠে? চীনাদের আদি পুরুষ কে?

২৩। চীনের প্রাচীন রাজাদের কথা সংক্ষেপে লেখ।

২৪। নদীর তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলির মধ্যে কি কি মিল দেখা যায়?

২৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) চীনের প্রধান দুটি নদী হল হোয়াং-হো আর —।

(খ) মোহেনজোদড়োতে মাটি খুঁড়ে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার করেন —।

(গ) মিশরে শ্রমিকদের — বলা হত।

———

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগের সমাজ

তামার পর মানুষ লোহার সন্ধান পেল। লোহার ব্যবহার শেখার ফলে মানব সভ্যতার বিরাট উন্নতি ঘটল। শুরু হল লৌহ যুগ।

লোহার আবিষ্কার—আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, পশ্চিম এশিয়ার আর্মেনিয়ান পর্বতমালা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। এখানকার এক বর্বর জাতি সহজ উপায়ে এবং সস্তায় লোহার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র বানাতে থাকে। সাধারণতঃ লোহাকে পিটিয়ে এইসময়ে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি বানানো হত প্রচণ্ড তাপে লোহা গলাবার উপায়টি মানুষ তখনও রপ্ত করতে পারেনি। জেনে রাখা ভাল, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতায়ও লোহার সামান্য ব্যবহার ছিল। আর্মেনিয়ান অঞ্চল পরবর্তীকালে মিতানি ও হিটাইট জাতির অধিকারে আসে। এরা প্রত্যেকেই লোহা ব্যবহারের কায়দাটি গোপন রাখত। তাই লোহার ব্যবহার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে কিছু দেরী হয়।

লোহা আবিষ্কারের ফলাফল—মানুষ লোহার হাতিয়ার ব্যবহার করায় অনেক সুবিধা হয়েছিল। (১) লোহা, তামা বা ব্রঞ্জের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত এবং টেকেও বেশী দিন। (২) তামা বেশী পাওয়া যায় না। তাই তার দামও খুব বেশী। কিন্তু লোহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে সেটি বেশ সস্তা। (৩) মূল্যবান তামা বা ব্রঞ্জের যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র কেবলমাত্র রাজা-মহারাজা ও ধনীরাই ব্যবহার করতে পারত। গরীবদের হাতিয়ার ছিল পাথরের তৈরী। কিন্তু লোহা বেশ সস্তা হওয়ায় গরীবরাও লোহার হাতিয়ার যোগাড় করে ফেলল। পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করার আর কোন প্রয়োজন রইল না। লোহা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ অনেকটা ঘুচিয়ে দিল। লোহার জিনিসপত্র সস্তা হওয়ায় তাদের চলনও খুব বেড়ে গিয়েছিল। (৪) লোহার লাঙল ইত্যাদি ব্যবহার করায় ফলন বেশী হল। লোহার কুড়ুলের সাহায্যে বনজঙ্গল সাফ করে চাষের জন্য নূতন জমিও যোগাড়

হয়েছিল। (৫) কারিগররা নিজেদের দরকারী যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে স্বাধীন-ভাবে জিনিসপত্র বানাতে লাগল। যন্ত্রপাতির অভাবে ধনীদের অধীনে তাদের আর কাজ করতে হল না। ভাল হাতিয়ার ব্যবহার করায় তাদের তৈরী জিনিসগুলিও আগের থেকে অনেক ভাল হল। (৬) যে সকল জাতি লোহার অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে জানত তারা সহজেই তাম্র-ব্রঞ্জ যুগের নগর সভ্যতাগুলি ধ্বংস করে ফেলল। কারণ তামা বা ব্রঞ্জের অস্ত্র, লোহার অস্ত্রের কাছে দাঁড়াতে পারত না।

লৌহ যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—পাহাড়-পর্বতের অধিবাসী বর্বর জাতিগুলিই প্রথম লোহার সন্ধান পায় এবং তার ব্যবহার শেখে। তাদের আক্রমণে পুরাতন সভ্যতাগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতির খুব একটা পরিবর্তন হয় না। সমাজের শ্রেণীগুলি প্রায় আগের মতই থাকে। কারিগররাও তেমন কোন অসুবিধা বোধ করে না। তবে ধনী ও বিলাসী শাসকদের পতনের ফলে বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন কিছুটা কমে যায়। লৌহ যুগে,বর্বর জাতিগুলি বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে, এবং অন্য দেশে বাড়তি জনগণকে বাস করতে পাঠায়। এইরূপ বসতিকে বলে উপনিবেশ। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় সুশাসন চালু হয় এবং চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান প্রদান ঘটে। রাস্তাঘাট নির্মিত হওয়ায়, যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার হয়। লৌহ যুগে চাষী, কারিগর ও বণিকরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে। এসময় হরফের ব্যবহার চালু হওয়ায় লেখাপড়া করা সহজ হয়। এ যুগে মুদ্রার প্রচলন হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি ঘটে। লৌহ যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। এযুগে জনসংখ্যা খুব বেড়ে যাওয়ায় খাবারের টান পড়ে। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ বেধে যায়।

জনগণ স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার পাওয়ায় স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে। এ সময় অনেক নূতন ধর্মের প্রবর্তন ঘটেছিল। এ সময় দর্শন ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে।

রাজার অবস্থা—লৌহ যুগে অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশে তাম্র-ব্রঞ্জ যুগের মতই রাজারা রাজত্ব করতে থাকেন। তবে রাজাদের ক্ষমতা

খুব বেড়ে যায়। তাঁরা বিশাল বিশাল, সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ফলে তাঁদের দাপটও বৃদ্ধি পায়। তবে রাজারা ধর্ম ও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ওপর তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তাম্র-ব্রঞ্জ যুগে এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া হত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এই যুগে বড় বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(ক) বিভাগ

(১) ব্যাবিলন

সুমের-এর কথা তোমাদের আগে বলেছি। এই সুমের-এর উত্তর-পশ্চিমে ছিল ব্যাবিলন। বর্তমান সিরিয়া অঞ্চল থেকে আমোরইট নামে এক যাযাবর জাতির শাখা এখানে এসে বসবাস করতে থাকে এবং এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত মেসোপটেমিয়া ব্যাবিলনের অধিকারে চলে আসে। ব্যাবিলন প্রথমে ছিল একটি গ্রাম। পরে এটি এক বৃহৎ নগরে পরিণত হয়। এটি ছিল এক বিশাল এবং সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। ব্যাবিলন নগরটি ছিল খুব উঁচু আর শক্ত এক বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। 'ব্যাবিলন' কথাটির অর্থ—দেবতার নগর। চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ব্যাবিলনের তুলনা মেলা ভার।

ব্যাবিলনের শাসনকর্তারা প্রথমে বোধহয় নগর দেবতা মারডুক-এর মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের কাজ করতেন। ব্যাবিলনের প্রথম রাজার নাম সুমু আবুম। তিনি আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে রাজত্ব করতেন। এই রাজ-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন হামুরাবি। তাঁর কথা পরে বলব।

চাষবাস—ব্যাবিলন ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। নানাপ্রকার শস্য, তিসি, জুের প্রভৃতি ছিল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

লাঙল দিয়ে চাষের কাজ করা হত। লাঙল টানত একজোড়া বলদ। জমি চাষের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া হত বীজ। জমিতে রীতিমত জলসেচ দেওয়া হত বলে প্রচুর শস্য ফলত। ব্যাবিলনের রাজারা খাল কেটে, মজা খালের সংস্কার করে, জলসেচের সুব্যবস্থা করেছিলেন। প্রধানতঃ কৃষির ওপর নির্ভর করলেও ব্যাবিলনের লোকেরা পশুপালনও করত।

ব্যবসা-বাণিজ্য—ব্যাবিলন ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। জলপথে ও স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ইলাম, ইরান, ভারতবর্ষ ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির সঙ্গে ব্যাবিলনের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। ব্যাবিলন খাদ্যশস্য, খেজুর, তিসি, তেল, চামড়া, পশম, মাটির পাত্র প্রভৃতি রপ্তানি করত। ভারতবর্ষ থেকে ব্যাবিলনে আমদানি হত সূতীবস্ত্র। অন্যান্য দেশ থেকে ব্যাবিলনে আসত সোনা, রূপো, তামা, পাথর, কাঠ, লবণ, ক্রীতদাস প্রভৃতি। জলপথে নৌকা ও জাহাজ এবং স্থলপথে গাধা ও ঘোড়া দিয়ে টানা গাড়ী মাল বহন করত। ব্যবসায়ীরা খুব ধনী ছিল। তারা চড়া সুদে টাকা ধার দিত। জমি প্রভৃতি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়া হত।

মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদায়—ব্যাবিলনের রাজারা খুব বড় ও উঁচু মন্দির নির্মাণ করতেন। তাঁরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করতেন বলে মন্দিরের সংখ্যাও ছিল বেশি। ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন মার্‌ডুক। এখানকার প্রধান দেবীর নাম ইশ্‌তার। ব্যাবিলনের নগর-দেবতা মার্‌ডুকের বিরাট মন্দির ছিল। এই মন্দিরের চূড়াকেই **ব্যাবেল-এর টাওয়ার** বলা হত। পাকা ইট দিয়ে মন্দিরগুলি তৈরী হত। মন্দিরগুলি নির্মিত হত খুব উঁচু মেঝের ওপর যাতে বন্যার জলে কোন ক্ষতি না হয়।

মন্দিরে দবতাদের বিগ্রহ বা মূর্তি থাকত। তাঁদের পূজার ভার ছিল পুরোহিতদের ওপর। পুরোহিতদের সম্মান ও ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। মন্দিরের বিষয় সম্পত্তির মালিক ছিলেন এই পুরোহিতগণ। মন্দিরের টাকা-পয়সা সুদে খাটিয়ে পুরোহিতরা বেশ লাভ করতেন। ভবিষ্যৎ গণনা করেও তাঁদের মন্দ আয় হত না। বলি দেওয়া ভেড়ার লিভার বা যকৃতের দাগ দেখে বা জলে তেলের ফোঁটা ফেলে তাঁরা ভবিষ্যতে কি ঘটবে বলে দিতেন। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি থেকেও তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারেন বলে দাবী করতেন। এইভাবে জ্যোতিষীর প্রচলন ঘটে। মন্দিরগুলিতে দেবদেবীর সেবা করার জন্য অনেক মেয়েও থাকত। শীঘ্রই মন্দিরগুলিতে খুব অনাচার দেখা দেয়। ব্যাবিলনের মন্দিরগুলিতে পাঠশালাও থাকত। এখানকার মন্দিরগুলি ছিল ধর্ম, বিদ্যাচর্চা ও ব্যবসার কেন্দ্র।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি—ব্যাবিলনে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল। মন্দিরের পাঠশালার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানতঃ লিখতে শেখান হত। লিখতে শেখা তখন খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। এর জন্য ৩৫০টি চিহ্ন শিখতে হত। লেখকদের খুব সম্মান ছিল সমাজে। ব্যাবিলনের একটি পাঠশালা মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে। এটি হল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো বিদ্যালয়। এর দেয়ালে লেখা আছে ঃ যে চমৎকারভাবে লিখতে পারবে তাঁর দীপ্তি হবে সূর্যের মত। বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা মাটির শ্লেটে লেখা অভ্যাস করত। কাঠ বা পাথরের টুকরো দিয়ে লেখা মুছে ফেলে আবার নূতন করে লেখা হত।

ব্যাবিলনে সুমের দেশের পূজা, আরাধনা, মন্দির নির্মাণ, সাহিত্য প্রভৃতি অনুকরণ করা হয়। ব্যাবিলনে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যারও বেশ উন্নতি হয়েছিল। ব্যাবিলনের লোকেরা পশমের সুন্দর কাপড় বুনতে পারত। কিন্তু তারা ভাল চিত্র বা পাথরের মূর্তি তৈরী করতে পারত না। এখানকার লোকেরা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হলেও নানা তুকতাক, যাদুমন্ত্র ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল।

হামুরাবির কোড—ব্যাবিলনের সর্ব প্রধান কীর্তি হল প্রচলিত আইনগুলির সংকলন বা সংগ্রহ। প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা হামুরাবি একটি গোল কালো রঙের পাথরের ওপর কতকগুলি আইন খোদাই করে রেখে যান। একেই বলে হামুরাবির কোড বা আইন সংহিতা। এই পাথরটি ছিল আট ফুট (২·৪৩মিঃ) লম্বা। এতে ২৮৫টি আইন লেখা রয়েছে। সুমেরে ও মিশরে হয়ত লিখিত আইন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হামুরাবির কোড-এর গুরুত্ব কম নয়। রোমানদের আগে আর কেউ



হামুরাবি

এত সুন্দর করে সাজিয়ে আইন রচনা করতে পারেনি। এই কোডে ব্যাবিলনের সমাজনীতি, শাসনপদ্ধতি ও দণ্ডবিধি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। এই কোডে ব্যক্তির সম্পত্তি, বিবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, মজুরী, ঋণ, চুরি, হত্যা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিধি-বিধান দেখা যায়।

হামুরাবির কোড-এর প্রথমে হামুরাবির সাম্রাজ্যের সীমা এবং তাঁর কীর্তিকাহিনীর কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এই কোড-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুষ্টের দমন ও দুর্বলকে রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। দেবতা আনু ও বেল মার্ডুক-এর আদেশে হামুরাবি নাকি এই আইন সংকলন করেছিলেন। এই আইন আক্কাদ-এর ভাষায় লেখা হয়।

হামুরাবি-র কোডের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ নেওয়া হত। রাম যদি একজনের মেয়েকে হত্যা করে তবে রামের মেয়ের হবে মৃত্যুদণ্ড। পিতাকে আঘাত করলে পুত্রের হাত কেটে ফেলা হত। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতির শাস্তি ছিল মৃত্যু। হামুরাবির সময় শাস্তি খুব কঠোর ছিল। চোর বা খুনেকে ধরতে না পারলে রাজা ক্ষতিপূরণ দিতেন। এত সুন্দর প্রথা বর্তমান কালের কোন দেশে এখনও চালু হয়নি।

হামুরবাবির কোডে সমাজচিত্র—হামুরাবি-কোড থেকে সে যুগের সমাজ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। এই সময় সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ছিল: (১) উচ্চ শ্রেণী (২) মধ্য শ্রেণী এবং (৩) নিম্ন বা ক্রীতদাসদের শ্রেণী। মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদারগণ উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এরা ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। অভিজাত বর্গ ও ক্রীতদাস,—এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি যে সব লোক ছিল তারা মধ্য শ্রেণীর। তারা খুব গরীব ছিল না। তবু উচ্চ শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। অপরাধ করলে অবশ্য তাদের লঘু শাস্তির বিধান ছিল। ক্রীতদাসগণ ছিল মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাদের কেনাবেচা চলত। পশুপালন ও কৃষিকাজে তাদের লাগান হত। তাদের অবস্থা ভাল ছিল না। অভিজাতগণের কোন ক্ষতি করলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কঠোর শাস্তি পেত। অভিজাতগণ অপরাধ করলে তাদের বেশী জরিমানা দিতে হত।

দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেওয়ার নিয়ম ছিল। কিছু কিছু শ্রমিক ও কর্মীর মজুরীও বেঁধে দেওয়া হত। কৃষকরা জমিদার ও পুরোহিতদের কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষবাস করত। জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক ভাল ছিল না। বেগার খাটাবার প্রথা চালু ছিল। প্রচুর ফসল ফলায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভ হওয়ায় জনগণের অবস্থা বেশ ভালই ছিল।

সমাজে মেয়েদের সম্মানজনক স্থান থাকলেও পুরুষই ছিল কর্তা। বিয়েতে যৌতুক দেওয়া হত ; বিবাহ-বিচ্ছেদও চালু ছিল। অপরাধ করলে পুরুষ অপেক্ষা নারীকে বেশী শাস্তি দেওয়া হত। স্ত্রী ছিল স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাকে সে দরকারমত বেচে দিতেও পারত।

(২) মিশরীয় সাম্রাজ্য

আগে আমরা মিশর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। মিশরের রাজা ফ্যারো বা ফ্যারাও তখন মিশর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। সাধারণতঃ মিশরের বাইরে রাজ্যবিস্তার করার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন না। তবে পাথর, কাঠ, মূল্যবান ধাতু প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্য তিনি এদেশে-ওদেশে সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন। আন্দাজ চার হাজার বছর আগে রাজা তৃতীয় সিসোসষ্ট্রেস সর্ব-প্রথম এশিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মিশরে দ্বাদশ রাজবংশের রাজত্বকালে প্যালেস্টাইন-এর হিক্‌সস নামে এক যাযাবর পশুপালক জাতি মিশর দখল করে নেয়। ঘোড়ায় টানা রথের সাহায্যে তারা মিশরীয়দের পরাজিত করে। হিক্‌সস রাজাদের 'রাখাল রাজা' বলা হত। এদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মিশরের দক্ষিণ বা উর্ধ্ব অঞ্চলের রাজা আহমিস তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি থিব্‌স এর রাজা নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তিনি হিক্‌সসদের মিশর থেকে বিতাড়িত করেন। এ ঘটনা ঘটে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। এরপর মিশরের সৈন্যবাহিনী হিক্‌সসদের তাড়া করে এশিয়ায় ঢুকে পড়ে। শীঘ্রই এশিয়ার এক বিরাট অংশ মিশরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই-ভাবে মিশর ধীরে ধীরে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হল। আহমিস মিশরে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম অষ্টাদশ রাজবংশ। নূতন

সম্রাটগণ বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন, তৈরী করলেন ভারী, ভারী, ঘোড়ায় টানা রথ আর সৈন্যবাহিনীতে রাখলেন তীরন্দাজ সৈন্য (যারা তীর ছুড়তে ওস্তাদ)। বেশীর ভাগ রাজাই ছিলেন খুব ভাল সেনাপতি ও যোদ্ধা।

আহমিসের পর প্রথম আমেনহটেপ রাজা হয়ে আফ্রিকায় অবস্থিত নিউবিয়া ও লিবিয়া আক্রমণ করেছিলেন। তিনি এশিয়াতেও প্রবেশ করেন। পরবর্তী রাজা প্রথম থাটমোস, ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত মিশর রাজ্যের সীমা বিস্তার করেছিলেন। তাঁর কন্যা রাণী হাট্‌সেপ্‌স্যুট খুবই শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী তৃতীয় থাটমোস ছিলেন সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী। রাণীর মৃত্যুর পর তিনি মিশরের সিংহাসনে বসেন। তৃতীয় থাটমোস সিরিয়ায় বিদ্রোহ দমন করে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলি জয় করেন। গ্রীসের নিকটবর্তী ঈজিয়ান দ্বীপগুলিও তাঁর অধিকারে এসেছিল। ফিনিসিয়া ও প্যালেস্টাইন তাঁর পদানত হয়। তিনি পরাজিত রাজ্যগুলি থেকে কর নিতেন : তাঁর প্রতিনিধি ও পরিদর্শকগণ ঐসব দেশে কিভাবে শাসন চলছে তা দেখাশোনা করতেন। দূর, দূর দেশে অবস্থিত রাজ্যগুলি বশে রাখার জন্য তিনি একটি নৌবহরও গড়ে তোলেন। পরাজিত দেশগুলি থেকে আনা ধনসম্পদে মিশর নানা দিক দিয়ে উন্নত হয়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সাম্রাজ্যের যুগে মিশরে বিরাট বিরাট মন্দির ও পাথরের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। কারনাক-এর মন্দির খুবই বিখ্যাত। এই সময় বহু ক্রীতদাসও মিশরে আসে। অনেক সময় দেশগুলির শাসনভার দেওয়া হত মিশরীয় শাসনকর্তাদের ওপর। পরাজিত দেশগুলিতে মিশরীয়রা বসবাস শুরু করে নানা উদ্দেশ্যে। এইভাবে বিদেশে মিশরীয়দের বসতি বা উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

মিশরীয় সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি ঘটে শান্তিপ্রিয় রাজা তৃতীয় আমেনহটেপ-এর রাজত্বকালে। পরবর্তী রাজা ইখনাটন-এর সময় থেকেই মিশর সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা দ্বিতীয় রামেসিস। তিনি হিটাইট নামে এক যাযাবর আর্য জাতিকে

পরাজিত করেন ও প্যালেস্টাইন অধিকার করেন। তিনি বহু অট্টালিকাও নির্মাণ করেছিলেন।

মিশরে পুরোহিতগণ প্রথম থেকেই বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। সাম্রাজ্য-যুগে তাঁদের ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। সম্রাটগণ নানা দেশ থেকে লুঠ করে আনা ধনরত্নের একটা বড় অংশ মন্দিরগুলিকে দান করতেন। ফলে মন্দিরগুলির মোহন্ত বা পুরোহিতরাও অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। প্রথম থাটমোস-এর রাজত্বকালে বিভিন্ন মন্দিরের পুরোহিতরা একটি সঙ্ঘ বা দল গঠন করেন এই সঙ্ঘের নেতা ছিলেন থিব্‌স্ নগরের আমনদেব-এর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। মিশরে তখন সূর্যদেব আমন-রা এবং অন্যান্য বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। রাজা ইখনাটন সূর্যদেব আটনকে একমাত্র ঈশ্বর বলে প্রচার করলেন। আটন ছাড়া অন্য দেবদেবীর পূজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এই সময় পুরোহিতগণ জঘন্য জীবন যাপন করতেন। মন্দিরগুলি অনাচারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। রাজা পুরোহিতদের সঙ্ঘটি ভেঙে দিয়ে পুরোহিতদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। সারা রাজ্যে একই ধর্মের প্রবর্তন করাও হয়ত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মূর্তিপূজা, পশুবলি ও জটিল আচার-অনুষ্ঠানেরও বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধর্মসংস্কারের ফলে পুরোহিতদের স্বার্থে মারাত্মক ঘা লাগল। তাঁদের অনেকে বেকার হয়ে গেলেন। সুতরাং তাঁরা রাজার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তুললেন। রাজা ছিলেন যুদ্ধের বিরোধী। তাই তিনি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ দমন করার কোন চেষ্টাই করলেন না। ফলে চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। ইখনাটনের পর পুরোহিতদের সাহায্যে রাজা হলেন তাঁর জামাতা টুটেন-খামেন। তিনি আটন দেবের পরিবর্তে আমনদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা আবার চালু করলেন। এইভাবে পুরোহিতরা আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। মিশরে উনবিংশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে পুরোহিতদেরই সাহায্যে। ফলে এই বংশের সম্রাটগণ পুরোহিতদের প্রচুর ধনসম্পদ দান করতে বাধ্য হন। এইভাবে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্রধান পুরোহিত হেরিহোর আজ থেকে তিন হাজার বছরের কিছু আগে নিজেই মিশরের সিংহাসনে উঠে বসলেন।

(৩) ইরান

মেসোপটেমিয়ার পূর্ব দিকে ইরান দেশ অবস্থিত। এদেশের উত্তরে ক্যাসপিয়ান সাগর এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর। ইরানের পূর্বে আফগানিস্তান এবং পশ্চিমে টাইগ্রিস নদীর উপত্যকা অঞ্চল। এদেশটির বেশীর ভাগ জমি রুক্ষ ও পাহাড়-পর্বতে ভরা। বিদেশ থেকে নানাজাতি এসে এদেশে বসতি স্থাপন করেছে। অতি প্রাচীনকালে আর্যভাষা ব্যবহারকারী এক জাতি ইরানে প্রবেশ করে। এরা মধ্য এশিয়ার খিবা এবং সমরকন্দ থেকে এদেশে আসে। এখানে এসে তারা কৃষিকাজে মন দেয় এবং নানা ধাতুর খোঁজ পেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে মিডিস ও পারসীক নামে আরও ছুটি ভাষাভাষী জাতি ইরানে এসে বসবাস শুরু করে। ঘোড়া, রথ ও লোহার অস্ত্রশস্ত্র আর্যদের অপরাজেয় করে তুলেছিল। আর্যদের বাসভূমিকে বলা হত আরিয়ানা। আরিয়ানা থেকে ইরান নামের সৃষ্টি হয়।

ইরানের একটি প্রদেশের নাম 'ফার্স'। এই 'ফার্স' বা পারস্ অঞ্চলের বাসিন্দা আর্য ভাষাভাষী জাতির নাম ছিল পারসীক। তাদের নাম থেকে পরে ইরানের নাম হয় পারস্য।

প্রথমে পারসীকগণ মিড জাতির অধীনে ছিল। মিডদের রাজ্যের নাম ছিল মিডিয়া। মিডিয়ার বিখ্যাত রাজা উভক্ষত্রের মৃত্যুর পর দুর্বল ইস্তুভেল্ড রাজা হন। তাঁর সময়ে পারসীকদের রাজা দ্বিতীয় কুরুশ মিডিয়া রাজ্য দখল করে নেন। দ্বিতীয় কুরুশ ছিলেন ইস্তুভেল্ড-এর দৌহিত্র (কন্যার পুত্র)। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই ঘটনা ঘটে। কুরুশের রাজধানী ছিল এগবাটানা নগরে। তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কুরুশের বংশের নাম আকিমিনীয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আকিমিনিস। আকিমিনিসের পুত্রের নাম চিস্‌পিস। তাঁর রাজত্ব কালেই বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক জরথুষ্ট্র ইরানে জন্মগ্রহণ করেন।

জরথুষ্ট্র—আজ থেকে প্রায় ছাব্বিশ শ' বছর আগে জরথুষ্ট্র ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তাঁর মায়ের নাম দুঘধোওয়া এবং

পিতার নাম পৌরুশস্প। তাঁর আগে ইরানে ম্যাগি নামে একদল পুরোহিত ছিলেন। তাঁরা নানা দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করতেন ও তুকতাক জানতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, শুভ-অশুভ অর্থাৎ ভাল ও মন্দের মধ্যে সব সময় যুদ্ধ চলছে। জরথুষ্ট্র এক ঈশ্বরের আরাধনা চালু করেন। তিনি অবশ্য ভাল ও মন্দের মধ্যে যুদ্ধের ধারণাটি গ্রহণ করেছিলেন।

ধর্মমত—জরথুষ্ট্রের ধর্মমত 'অবেস্তা' নামে একটি পবিত্র গ্রন্থে লেখা আছে। এতে বহু সুন্দর সুন্দর স্তবস্তুতি ও প্রবাদ রয়েছে। জরথুষ্ট্রের মতে, জগতে সব সময় ভাল ও মন্দের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। ভাল'র প্রতীক হলেন সৃষ্টি কর্তা পরম দেবতা আহুর-মাজদা। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর। তাঁর শত্রু হল আহ্রিমান। সব ভাল লোক আহুর মাজদার দিকে এবং সব খারাপ লোক আহ্রিমান-র পক্ষে। আহ্রিমান শয়তানের অবতার। মিথস বা আলো আহুর মাজদার সঙ্গী। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আহুর মাজদা জয়ী হবেন বলে জরথুষ্ট্র মনে করতেন। তাঁর মতে মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষের বিচার হবে। এই শেষ বিচারের পর ঈশ্বর পুণ্যবানদের স্বর্গে পাঠাবেন। পাপীদের ছেড়ে দেওয়া হবে শয়তান আহ্রিমানের কবলে। তাদের স্থান হবে পাতালের অন্ধকারে। জরথুষ্ট্র ছিলেন মূর্তিপূজা ও জটিল আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী। তিনি তাঁর শিষ্যদের সৎ পবিত্র জীবন যাপন করতে বলতেন। পারস্যের রাজারা এই ধর্ম গ্রহণ করায় এটি খুবই প্রভাবশালী হয়। এখন অবশ্য জরথুষ্ট্রের ধর্মের কোন চিহ্ন নেই। ভারতবর্ষে বসবাসকারী কিছু পারসী এখনও এই ধর্মে বিশ্বাসী। জরথুষ্ট্র আগুনকে পবিত্র বলে মনে করতেন। তিনি কিন্তু আগুনকে পূজা করার কথা কখনও বলেননি। জরথুষ্ট্রর শিষ্যরা মৃতদেহকে কবরে রাখে না। একটি উঁচু জায়গায় তা রেখে দেওয়া হয়। শীঘ্রই শকুনি-গৃধিনীরা সেটি খেয়ে ফেলে।

(৪) ইহুদীদের কাহিনী

ইহুদীরা সেমেটিক জাতিভুক্ত। পরে এরা হিব্রু নামেও পরিচিত হয়। ইহুদীরা আরবের মরুভূমিতে যাযাবরের জীবনযাপন করত। পশুপালনই ছিল তাদের জীবিকা। এরা নানা উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। খুব

প্রাচীনকালে ইহুদীরা মেসোপটেমিয়ায় বাস করত বলে জানা গেছে। প্রায় চার হাজার বছর আগে ইহুদীরা তাদের নেতা এব্রাহাম-এর সঙ্গে প্যালেস্টাইনে এসে বসতি স্থাপন করে। প্যালেস্টাইন ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে একটি ছোট দেশ। এদেশে একবার খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কিছু ইহুদী উর্বরা মিশর দেশে চলে যায়। কিছুদিন পর হিক্‌সস নামে একটি সেমেটিক জাতি মিশর দখল করে নেয়। ইহুদীরাও সেমেটিক বলে হিক্‌সসদের সঙ্গে তাদের খুব ভাব হয়। হিক্‌সসরা ইহুদীদের কাজকর্ম দেয় এবং তারাও প্রভুদের জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করতে থাকে। কিন্তু মিশরবাসীরা হিক্‌সসদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর ইহুদীদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। হিক্‌সসদের সমর্থন করত বলে মিশরীয়রা তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালায়। শীঘ্রই ইহুদীরা মিশরীয়দের দাসে পরিণত হয়। খাল কাটা, মন্দির ও পিরামিড নির্মাণ এবং আরও অনেক খাটুনির কাজে ইহুদীদের লাগান হতে থাকে। তারা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য মিশরের সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ফ্যারো দ্বিতীয় রামেসিস-এর সময় ইহুদীদের ওপর অত্যাচার চরমে ওঠে। ইহুদীদের এই চরম দুর্দিনে এক ইহুদী পরিবারে জন্ম নিলেন মোজেস। বড় হয়ে



মোজেস

ইনিই ইহুদীদের দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। আজ থেকে তিন হাজার বছরের কিছু আগে তাঁর জন্ম হয়।

মুক্তিদাতা মোজেস—মোজেস দীর্ঘকাল ধরে মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করে যাযাবরের জীবনে অভ্যস্ত হন। এখানেই ঈশ্বর জেহোভা তাঁকে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে যেতে বলেন। মোজেস বিন্দুমাত্র দেরী না করে ইহুদীদের ঐক্যবদ্ধ করেন। তারপর তিনি ইহুদীদের নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন ফ্যারোর কাছে। ফ্যারো রাজী না হওয়ায় জেহোভা মিশরে নানা উৎপাতের সৃষ্টি করেন। এতে ভয় পেয়ে ফ্যারো ইহুদীদের মিশর ত্যাগের অনুমতি দিলেন। মোজেসের নেতৃত্বে সব ইহুদী তাদের জিনিসপত্র নিয়ে মিশর ছেড়ে প্যালেস্টাইনের দিকে রওনা হল। বাইবেলে ইহুদীদের এই মিশর ত্যাগকে মহানিষ্ক্রমণ বা এক্সোডাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেল হল ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ফ্যারো কিছুদিন পরেই তাঁর মত বদলান এবং ইহুদীদের মিশরে ফিরিয়ে আনতে এক বিরাট সৈন্যদল পাঠান। কিন্তু মোজেস সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে লোহিতসাগর পেরিয়ে সিনাই মরুভূমিতে চলে আসেন। জেহোভার কৃপায় ইহুদীরা সাগরের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে আসে। একাজ করতে গিয়ে মিশরের সৈন্যরা কিন্তু জলে ডুবে মারা যায়। সিনাই মরুভূমিতে অবস্থিত সিনাই পর্বতে গিয়ে মোজেস জেহোভার কাছ থেকে দশটি আদেশ বা অনুজ্ঞা লাভ করেন। এগুলি টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস বা দশ অনুজ্ঞা নামে খ্যাত। অনুজ্ঞাগুলি লেখা ছিল পাথরের দুটি টুকরোয়। এগুলির মূল কথা হল, ইহুদীরা তাঁদের মুক্তিদাতা জেহোভা ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে পূজা করবে না। তারা মাতা ও পিতাকে শ্রদ্ধা করবে, সকলে রবিবারে বিশ্রাম করবে এবং চুরি ও খুন করা থেকে বিরত থাকবে। তারা অন্যের জিনিসে লোভ করবে না এবং প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যও দেবে না। মোজেস ইহুদীদের এই সকল অনুজ্ঞা পালন করতে বলেন। তিনি প্যালেস্টাইনে পৌঁছুবার আগেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাঁর সব থেকে বড় কীর্তি হল, কয়েক শ' বছর ধরে ক্রীতদাসের জীবন যাপনকারী ইহুদীদের স্বাধীনতা দেওয়া। তিনি তাদের মধ্যে একতা আনেন, তাদের স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন

শেখান ও তাদের নিয়ে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন। শেষপর্যন্ত তাদের নূতন বাসস্থানের পথও দেখান। মোজেস ইহুদী ধর্মের একজন প্রধান প্রবর্তক। তিনিই সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের আরাধনা চালু করেন। তাঁর ধর্মমত গ্রীষ্টধর্মের উত্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

(খ) বিভাগ

গ্রীস

দক্ষিণ ইউরোপে অবস্থিত গ্রীস দেশটির তিনদিকেই জল। এটি একটি উপদ্বীপ। প্রাচীনকালের ইতিহাসে গ্রীসের স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। গ্রীসের অধিবাসীরা গ্রীক বা হেলিনীজ নামে পরিচিত। মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে



গ্রীকদের দান খুবই বেশী। গ্রীক সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, শাসনব্যবস্থা, বর্ণমালা, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধূলা প্রভৃতি জগতকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

গ্রীসের আদি বাসিন্দাদের সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে দক্ষিণ গ্রীসে একটি নূতন সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে। এর নাম ঈজিয়ান বা মাইসিনীয় সভ্যতা। ঈজিয়ান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল ক্রীট দ্বীপ। এটি ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

ক্রীটের সভ্যতা—আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে এক শ্বেতকায় জাতি ক্রীটে বসবাস করত। তারা ব্রঞ্জের ব্যবহার জানত। আন্দাজ চার হাজার বছর আগে তাদের সভ্যতা অত্যন্ত উন্নত হয়ে উঠে। ক্রীটের সভ্যতাই, ইউরোপের প্রাচীনতম সভ্যতা। ক্রীট ভূমধ্যসাগরের পূব-তীরের দেশগুলি ও মিশরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সমগ্র ঈজিয়ান অঞ্চলে ক্রীটের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। মাটি খুঁড়ে ক্রীটের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়েছে। ক্রীটের জনগণ চাষবাস করে প্রচুর খাদ্য ফলাত। তারা সোনা, রূপা ও ব্রঞ্জ দিয়ে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর জিনিস-পত্র ও অলংকার তৈরী করত। তারা ছিল, খুব পাতলা, নক্সা কাটা, রঙ-বেরঙের মাটির পাত্র বানাতে ওস্তাদ। তাদের শিল্প ও বর্ণমালা ছিল খুবই উন্নত ধরনের। তারা বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রাও ব্যবহার করত। ক্রীটের বাসিন্দারা নোসস, ফিস্টাস প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট নগর মির্মাণ করে ক্রীটের নগরগুলিতে বড় বড় প্রাসাদ,



ক্রীটের চিত্র

অট্টালিকা, স্নানাগার, জলনিকাশের জন্য নর্দমা, জল সরবরাহের জন্য মাটির পাইপ বা নল প্রভৃতি ছিল। বাড়ীগুলি পাথর, ইট ও কাঠ দিয়ে তৈরী হত। বাড়ীগুলিতে ঘোরানো সিঁড়ি ছিল। প্রাসাদের দেওয়ালে নাগরিকদের বিলাস-ময় জীবনযাত্রার চিত্র আঁকা থাকত। ভূমিকম্পে ক্রীটের নগরগুলির খুব ক্ষতি

হয়। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ গ্রীসের বাসিন্দা এক জাতি ক্রীট দখল করে নেয়। এরা মাইসিনীয় নামে পরিচিত। মাইসিনীয়গণ ক্রীটের সভ্যতা গ্রহণ করেছিল। পরে পূর্ব ইউরোপ থেকে আসা এক আর্য জাতি মাইসিনীয়দের পরাজিত করে গ্রীস দখল করে নেয়। এই জাতিরই নাম গ্রীক। গ্রীকগণ, মাইসিনীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে তাকে আরও উন্নত করে তোলে এবং বিশ্বের নানা স্থানে এই সভ্যতা ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে মূল সভ্যতা অর্থাৎ ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব সভ্য তুনিয়ার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ক্রীটের উন্নত নগর-সভ্যতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাফল্য গ্রীস ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাসিন্দাদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

হোমার-এর যুগ—হোমার ছিলেন গ্রীসের মহাকবি। আমাদের দেশের বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মতই তিনি মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁর রচিত মহাকাব্য তুটি,—ইলিয়াড ও অডিসি। আন্দাজ আড়াই হাজার বছর আগে হোমার এই মহাকাব্য তুটি রচনা করেন। প্রচলিত কাহিনীর উপর নির্ভর করেই তিনি এগুলি রচনা করেছিলেন। ইলিয়াডের মূল কথা, গ্রীকগণ কর্তৃক ভূমধ্যসাগরের পূবতীরে অবস্থিত ট্রয়নগর ধ্বংস। অডিসি থেকে জানা যায় গ্রীকবীর অডিসিয়ুসের কাহিনী। হোমারের মহাকাব্য তুটি থেকে প্রাচীন গ্রীকদের বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যায়। এই যুগে লোহা খুব মূল্যবান ধাতু বলে গণ্য হত। এই সময়ে গ্রীসে অনেকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। রাজার ক্ষমতা ছিল খুব বেশী। ধনী সম্প্রদায় ও জনগণের তুটি সভা রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত।

জনগণ বড় পরিবারে বাস করত। পরিবারই জমির মালিক। পরিবারের কর্তার ক্ষমতা ছিল অসীম। জনগণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) প্রচুর জমির মালিক অভিজাত সম্প্রদায়, (২) অল্প জমির মালিক চাষী, (৩) জমিহীন মজুর, (৪) ক্রীতদাস। জনগণ সাদাসিধে গ্রাম্য জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। কৃষি ও পশুপালন ছিল প্রধান জীবিকা। জলদস্যুতা চালু ছিল। ধনী ও গরীব সকলেই পরিশ্রম করত। রাজায় রাজায় প্রায়ই যুদ্ধ চলত বলে তুর্বল ও গরীবদের অবস্থা ভাল ছিল না। মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলার অধিকার ছিল। এই সময়ে গ্রীকগণ বহু দেবদেবীর পূজা করত।

রাজা ও বড়লোকেরা বিলাসময় জীবনযাপন করত। পান-ভোজন, সঙ্গীত ও দুঃসাহসিক অভিযান তাদের প্রিয় ছিল।

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র—গ্রীস একটি উপদ্বীপ বলে এর তিনদিকেই সাগর। এই সাগর দক্ষিণ গ্রীসকে উত্তর গ্রীস থেকে প্রায় আলাদা করে দিয়েছে। সাগরের জল গ্রীসের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে নানা জায়গায়। অজস্র পাহাড়-পর্বত দেশটিকে নানা অংশে ভাগ করে রেখেছে। এজন্য যোগাযোগের ব্যবস্থা খুবই খারাপ। ফলে গ্রীসে বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা খুবই কঠিন। ছোট ছোট অংশ-গুলিতে তাই গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট নগর-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র। বেশীর ভাগ রাষ্ট্রে জনগণই শাসনকার্য চালাত। নগরগুলির বাসিন্দারা নিজেদের রাষ্ট্রের স্বাধী-নতাকে খুবই মূল্যবান মনে করত। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা প্রাণ দিতেও দ্বিধা করত না। তারা নিজের রাষ্ট্রকেই সব থেকে সভ্য ও উন্নত বলে মনে করত। নিজেদের রাষ্ট্রকে উন্নত করে তোলার জন্য নাগরিকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকত না। এজন্যই গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতিতে অন্য দেশগুলিকে টেক্কা দিতে পেরেছিল।



গ্রীসের চিহ্নিত পাত্র

যোগাযোগ—নগর-রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বি-তার ভাব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যোগা-যোগ কম ছিল না। গ্রীকগণ ছিল একই জাতিভুক্ত। তাদের ভাষা ও ধর্মও ছিল এক। তাই তারা প্রায়ই নানা উৎসবে, পূজা-আরাধনা ও খেলাধূলার সময় একসঙ্গে মিলিত হত। ডেল্‌ফি র অ্যাপোলো দেবের মন্দিরে গ্রীকরা বছরে

দুবার জমায়েত হত বলে জানা যায়। গ্রীকগণ অলিম্পিয়া ও আরও কয়েকটি জায়গায় খেলাধূলার জন্য জড় হত।

একস্থানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোক জড় হওয়ায় ভাবের আদান-প্রদান ঘটত। এই জমায়েতগুলিতে ইতিহাস ও সাহিত্য-চর্চা, ধর্ম বিষয়ে আলোচনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুযোগ হত। এক দেশের দেবমন্দির ও বিগ্রহের সৌন্দর্য অন্য দেশের শিল্পীদের প্রভাবিত করত। এইভাবে গ্রীক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

উপনিবেশ স্থাপন—নানা কারণে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলি বিদেশে বসতি বা উপনিবেশ স্থাপন করে। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করতে হয়। অভিজাতদের শাসনে বিরক্ত হয়ে অনেকে অন্য দেশে চলে যায়। জমিদারগণ বেশীর ভাগ জমি হস্তগত করায় অনেক গরীব চাষী বিদেশে যেতে বাধ্য হয়। গ্রীসে বেশী শস্য ফলে না। তাই উর্বর বিদেশী জমিতে বসবাস করা বেশ লাভজনক ছিল। বাণিজ্যের প্রয়োজন এবং নূতন দেশ দেখার আগ্রহ থেকেও তারা অন্য দেশে যেত। গ্রীকগণ নানা দ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরের চারিদিকে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলির সঙ্গে তাদের নগর-রাষ্ট্রের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। উপনিবেশগুলি ছিল মূল রাষ্ট্রের আদর্শে গড়া। এগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য করে খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা সব থেকে বিখ্যাত। অন্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে করিন্থ, থিব্‌স্ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। গ্রীসের উত্তর-পূর্ব অংশে এথেন্স ও দক্ষিণ অংশে স্পার্টা অবস্থিত।

এথেন্স ও স্পার্টা—এথেন্স ও স্পার্টার জনগণ একই ভাষায় কথা বলত। কিন্তু তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলই ছিল বেশী। আগে এই দুই নগরের জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলা যাক। পরে এদের গরমিলগুলি দেখানো যাবে।

এথেন্স : রাজনৈতিক জীবন—এথেন্সে প্রথমে রাজারা শাসন করতেন। কিছুদিন পর সেখানে অভিজাত ও বড় লোকদের শাসন চালু হয়। অভিজাতগণ জনগণের ওপর অত্যাচার করতেন। তাই ধীরে ধীরে

এথেন্সে অভিজাততন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র বা জনগণের শাসন চালু হল। এযুগে জনগণের প্রতিনিধি সভাকে সকল ক্ষমতা দেওয়া হয়। শাসকগণ ভোটদাতাদের মধ্য থেকে লটারির সাহায্যে নির্বাচিত হতেন।

সরকারী পদে যাঁরা কাজ করতেন তাদের ভাতা দেবার ব্যবস্থা ছিল। ফলে গরীবরাও সরকারের কাজে অংশ নিতে পারত। তেইশ বছর বয়স হলে প্রতিটি নাগরিক লোকসভায় গিয়ে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করত ও বিচার আচার করার সুযোগ পেত। নাগরিক হিসাবে তারা নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।

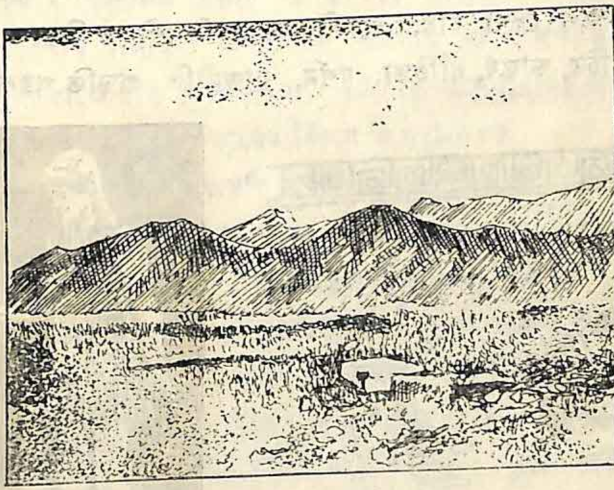


এথেন্স নগরীর দুর্গ

সামাজিক জীবন—এথেন্সের জনগণ সচ্ছল জীবনযাপন করত। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য। পরিশ্রমের কাজগুলি সাধারণতঃ ক্রীতদাসরাই করত। ছেলেদের শিক্ষার জন্য অনেক পাঠশালা ছিল। এগুলিতে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হত। তারা যুদ্ধ বিদ্যাও শিক্ষা করত। মেয়েরাও লেখাপড়া জানত। সেলাই ও গান-বাজনার দিকে তাদের ঝোঁক ছিল। বিয়ের পর মেয়েরা বড় একটা বাইরে বেরত না। জনসাধারণের ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র ছিল সাধারণ ধরনের। তাদের বেশভূষা ও অলংকারও ছিল সাদাসিধে।

বড়লোকেরা অনেক ভাল খাবার-দাবার খেলেও সাধারণ লোক রুটি, মদ, মাছ ও শাক-সব্জীতেই সন্তুষ্ট ছিল। জনগণ রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির চর্চা করতে ভালবাসত।

স্পার্টার রাজনৈতিক জীবন—স্পার্টায় দুইজন রাজা ও অভিজাতগণ শাসনকার্য চালাতেন। শাসন-ব্যাপারে জনগণের তেমন কোন অধিকার ছিল না। তবে তাদের উপর অত্যাচার করা হত না। লাইকারগাস নামে এক ব্যক্তি স্পার্টার নাগরিকদের জীবন কঠোর নিয়মকানুনে বেঁধে দেন। স্পার্টায় রুগ্ন শিশুকে মেরে ফেলা হত। সাত বছর বয়স হলেই শিশুকে



স্পার্টার অবস্থান

সৈন্য-শিবিরে নিয়ে গিয়ে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক পুরুষ শিবিরে থাকতে বাধ্য ছিল। স্পার্টানগণ, স্পার্টার আদিবাসী হেলটগণকে দাবিয়ে রাখার জন্যই এত ভাল করে যুদ্ধ শিখত। নাগরিকদের রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী সব সময় চলতে হত, তাদের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার কোন দাম ছিল না। পেটভরে খাওয়া বা বিলাস-ব্যসন কাকে বলে তারা তা জানত না।

সামাজিক জীবন—স্পার্টার নাগরিকগণ শুধু নিয়ম শৃঙ্খলা, শরীর চর্চা ও যুদ্ধবিদ্যাই শিখত। তাদের সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা ছাড়া অন্য কোন গুণ ছিল না। এদেশের মেয়েরাও শরীর-চর্চা করত। স্পার্টানগণ অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করত। বিশ বছর বয়সে তারা বিয়ে করতে পারত। তাদের জীবনে আনন্দের পরিমাণ ছিল খুবই কম। তাই তাদের স্বভাব ছিল গম্ভীর ও অমিশুকে।

এথেন্স ও স্পার্টার তুলনা—এথেন্স নৌশক্তিতে বড়; স্পার্টা ছিল বড় স্থলশক্তি। এথেন্সে ছিল গণতন্ত্র, স্পার্টাতে অভিজাততন্ত্র। এথেন্স স্পার্টার চেয়ে বেশী ধনীও ছিল। এথেন্স ও স্পার্টার বাসিন্দাদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, এথেনীয়গণ হাসিখুশী ও মিশুকে। তারা নাচগান, চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি পছন্দ করে।



এথেন্সের মেয়েরা বীণা বাজাচ্ছে



স্পার্টার মেয়ে দৌড় অভ্যাস করছে

নূতন নূতন জিনিসের দিকে তাদের বেশ আগ্রহ। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল বোঝে। দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র থাকায় জনগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে

পারে। এথেনীয়রা ছিল আইওনীয় জাতিভুক্ত। অন্যদিকে ডোরীয় জাতির স্পার্টানগণ খুব বলিষ্ঠ, স্থলযুদ্ধে পারদর্শী ও অহঙ্কারী। তারা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু জানে না। তাদের ব্যবহার রুক্ষ ও অমার্জিত। তারা ছিল নিষ্ঠুর ও একগুঁয়ে। তাদের সাহিত্য ও শিল্প বলতে কিছু নেই। তাদের দেশে অভিজাতগণই সর্বশক্তিমান। স্বাধীন চিন্তার কোন স্থান সেদেশে নেই। স্পার্টানরা কোনরূপ পরিবর্তন পছন্দ করত না। তারা অত্যন্ত স্বার্থপর ও লোভী। এক কথায় এথেনীয়রা ছিল রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ আর স্পার্টানরা ছিল নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র।

এথেন্স ছিল সমুদ্রের ধারে বেশ উঁচু খোলামেলা জায়গায়, আর স্পার্টার অবস্থান ছিল এক গভীর উপত্যকার মধ্যে—যার চারিদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। প্রাকৃতিক অবস্থার এই পার্থক্য দুদেশের জনগণকে পৃথকভাবে গড়ে তুলেছিল। স্পার্টানরা এথেনীয়দের উন্নতিকে ভাল চোখে দেখত না। তারা তাদের হিংসে ও ঘৃণা করত।

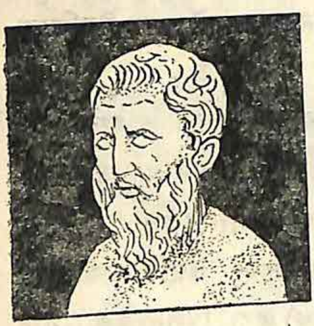
উন্নত এথেন্স—গ্রীসের মধ্যমণি ছিল এথেন্স। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অন্য কোন নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের কাছে দাঁড়াতে পারত না। সাহিত্য, শিল্প ও ধর্মে সে কত উন্নত ছিল, সে বিষয়ে দু'কথা বলা যাক।

সাহিত্য—এথেন্সে নাটক ও থিয়েটারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। নাটকগুলি ছিল বিয়োগান্তক (যা শেষ হয় দুঃখে) এবং মিলনান্তক (যার শেষ আনন্দে)। বিয়োগান্তক নাটকের প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন ইস্কাইলাস। বিয়োগান্তক নাটককে উন্নত করে তোলেন সফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশী নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকে তিনজন অভিনেতা থাকত। তিনি পেরিক্লিসের শাসনকালে এথেন্সে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকের নাম অ্যান্টিগণ। তাঁর নাটকে দেখা যায়, মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও অদৃষ্টের বিধান অগ্রাহ্য করতে পারে না—শেষ পর্যন্ত তাকে তা মেনে নিতে হয়। এ যুগের আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন ইউরিপিডিস। তিনি তাঁর নাটকে যুক্তিবাদ প্রচার করেন। তাঁর নাটকে দেখা যায় সাধারণ মানুষের জয়গান।

আগামেমনন, প্রমিথিউস আনবাউণ্ড তাঁর বিখ্যাত নাটক। হাসির নাটক লিখে অ্যারিস্টোফেনিস খুব নাম করেন। পাখী, বোলতা, মেঘ, প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত নাটক। তিনি ছিলেন নূতন রীতি-নীতির বিরোধী। নূতন পথের পথিক ও বড় বড় নেতাদের ব্যঙ্গ করে তিনি সবাইকে হাসাতেন।

শিল্প—এথেন্সে ভাস্কর্য ও শিল্পকলারও খুব উন্নতি ঘটে। ক্যালামিস ও ফিডিয়াস পাথরের অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরী করেছিলেন। ফিডিয়াসের এথেনাদেবীর মূর্তী বিখ্যাত। ইক্টিনাস তৈরী করেন অসংখ্য অপূর্ব সুন্দর মন্দির। তাঁর নির্মিত পার্থেনন মন্দিরটি বিশ্ববিখ্যাত।

ইতিহাস—পেরিক্লিসের শাসনকালে গ্রীসের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও থুকিদিদিস বর্তমান ছিলেন। হেরোডোটাস লেখেন পারসীকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রীসের সংগ্রামের ইতিহাস। তাঁর গ্রন্থের নাম 'পারসীক যুদ্ধের ইতিহাস'। এতে আরও অনেক দেশের ইতিহাস লেখা আছে। হেরোডোটাস নানা দেশ ঘুরে তার পুস্তকের মাল-মসলা সংগ্রহ করেন। তাঁকে ইতিহাসের স্রষ্টা বা জনক বলা হয়ে থাকে। থুকিদিদিস স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী লিখে গেছেন। তাঁর ইতিহাস আধুনিক ঐতিহাসিকরা আদর্শ বলে মনে করেন।



হেরোডোটাস

ধর্ম—এথেনীয়গণ বহু দেব-দেবীর আরাধনা করত। দেবী এথেনা ছিলেন এথেন্সের প্রধান দেবী। মন্দির তৈরী করে তাতে



দেবতা অ্যাপোলো

দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার রীতি ছিল। দেবদেবীর কাছে পশুবলি ও নানা উপহার দেওয়া হত। কোনো ব্যাপারে দেবদেবীর মতামতও তারা গ্রহণ করত। একে বলা হত অর‍্যাকল বা দৈববাণী।

পেরিক্লিস—পেরিক্লিসের কথা আগে কিছুকিছু বলা হয়েছে। ইনি ছিলেন এথেন্সের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান পরিচালক। আজ থেকে প্রায় চব্বিশ-শ’ বছর আগে



দেবী এথেনা



পেরিক্লিস

তিনি বর্তমান ছিলেন। ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে তিনি এথেন্সে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। পেরিক্লিস দীর্ঘকাল ধরে এথেন্সের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন। তিনি জনগণকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে এথেন্সের গণতন্ত্রকে নিখুঁত করেন। তাঁর সময় এথেন্সে সকল বিষয়ে উন্নতি ঘটে। তাঁর উৎসাহে সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এথেনীয়গণ চরম উন্নতি লাভ করে। তিনি এথেন্সের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এটি সুরক্ষিত করার জন্যও তিনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। পেরিক্লিসের সময়ই স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের পেলোপনেসীয়

যুদ্ধ শুরু হয়। **পেরিক্লিস** অধীনস্থ রাজ্যগুলিকে শোষণ করে এথেন্সের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন।

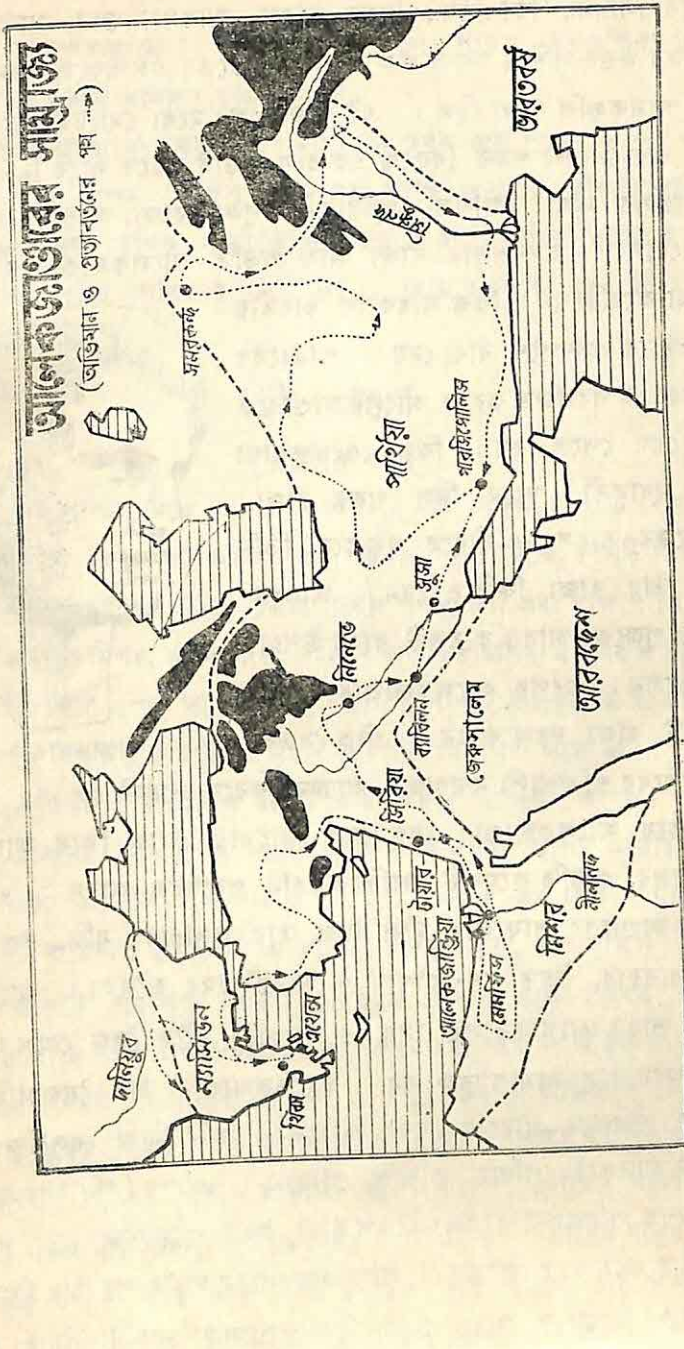
পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের সব থেকে বিখ্যাত লোক ছিলেন **সক্রেটিস**। তিনি ছিলেন পরম জ্ঞানী দার্শনিক। এথেন্সের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তিনি লোকজনদের নানা রূপ প্রশ্ন করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের কুসংস্কার ও বহু দিনের মিথ্যা বিশ্বাসগুলিকে ভেঙে দেওয়া। তিনি যুক্তির সাহায্যে সব কিছু বিচার করতে বলতেন। গুরুজনদের কথাও অন্ধভাবে পালন করতে তিনি নিষেধ করেন। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। তিনি গণতন্ত্রেরও সমালোচনা করতেন। তরুণরা তাঁর খুব ভক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর মতবাদ এথেন্সের শাসকবর্গ ও বয়স্ক জনগণের ভাল লাগল না। তাই তাঁরা সক্রেটিসের বিচার করে তাঁর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করল। তীব্র বিষ পান করে সক্রেটিসকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।


সক্রেটিস

ম্যাসিডন

গ্রীসের উত্তরাংশে একটি ছোট রাজ্যের নাম ম্যাসিডন। রাজা ফিলিপ এই রাজ্যটিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি সমগ্র গ্রীস জয় করতে সমর্থ হন। পুত্র আলেকজাণ্ডারের জন্য তিনি রেখে যান পরিপূর্ণ কোষাগার, স্থায়ী সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী ও পারস্য জয়ের পরিকল্পনা।

ফিলিপ, পুত্র আলেকজাণ্ডারকে যুদ্ধ ও অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ছিলেন দুঃসাহসী যোদ্ধা। তাঁর বুদ্ধিও ছিল খুব। পৃথিবী জয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আজ থেকে তেইশ শ'বছর আগে তিনি দিগ্বিজয়ে বের হন। মাত্র তের বছরের মধ্যে তিনি এশিয়া


আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য
(অভিযান ও প্রত্যাবর্তনের পথ --->)
দানিয়ুব
ম্যাসিডন
থিবস
এথেন্স
নিনেভে
সিরিয়া
টায়ার
আলেকজান্ড্রিয়া
মেমফিস
ব্যাবিলন
সুসা
জেরুসালেম
পার্থিয়া
পারসিপোলিস
সমরকন্দ
সিন্ধুনদ
ভারতবর্ষ
মিশর
নীলনদ
আরবদেশ

মাইনর, সিরিয়া, ফিনিশিয়া, মিশর, পারস্য, আফগানিস্তান, সমরকন্দ ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জয় করেন। ভারতের এই অঞ্চলে তখন ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না। এরা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করতে পারে নি। এই রাজ্যগুলির মধ্যে তক্ষশিলা, পুষ্করাবতী, পুরুর রাজ্য, অভিসার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি প্রভৃতি আলেকজাণ্ডারকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় রাজা তাঁকে প্রাণপণে বাধা দেয়। পাঞ্জাবের পুরুরাজাকে পরাজিত করতে আলেকজাণ্ডারকে বেশ বেগ পেতে হয়। ঝিলম ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল পুরুর রাজ্য। পুরুরাজের সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। আলেকজাণ্ডার পুরুকে আরও কয়েকটি রাজ্য উপহার দিয়েছিলেন। এরপর আলেকজাণ্ডার আরও কয়েকটি রাজ্য দখল করেন। গ্রীক সৈন্যরা কিন্তু মগধের শক্তিশালী নন্দরাজ্য আক্রমণ করতে সাহসী হল না। তাই হতাশ হয়ে আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের মোহনার কাছে ফিরে আসেন। পথে মালব প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে তিনি পরাজিত করেন। ভারতে আলেকজাণ্ডারের সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি, দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবহার, উন্নত রণ-কৌশল ও ভারতীয়দের অনৈক্য। আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ করলেও সিন্ধু ও পাঞ্জাবে গ্রীক সৈন্য রেখে যান। এ দুটি স্থান তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আলেকজাণ্ডার তাঁর সৈন্যবাহিনীর একাংশ জলপথে পারস্যে ফেরৎ পাঠান। তিনি নিজে বেলুচিস্তানের মরুভূমি অতিকষ্টে পেরিয়ে পারস্যে পৌঁছান। এরপর তিনি আরব দেশ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু হঠাৎ জ্বরে পড়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর তিনজন সেনাপতি, নিজেদের মধ্যে প্রভুর বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করে



আলেকজাণ্ডার

নেন। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে পূবের দেশগুলির সহিত ইউরোপের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ম্যাসিডন দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ম্যাসিডনরাজ পঞ্চম ফিলিপ রোম-এর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। ম্যাসিডন শীঘ্রই রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছু দিনের মধ্যেই রোম সমগ্র গ্রীস অধিকার করে নেয়। প্রায় একুশ শ' বছর আগে এই ঘটনা ঘটে।

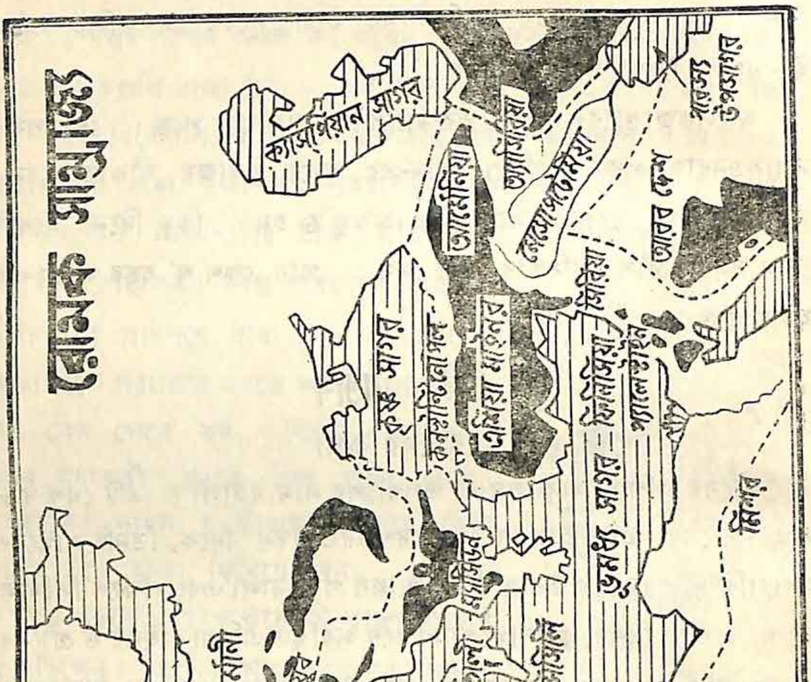
(গ) বিভাগ

রোমের কথা

গ্রীসের পশ্চিম দিকে লম্বাটে উপদ্বীপের নাম ইটালী। এটি বেশ বড়-সড়—গ্রীসের প্রায় চারগুণ। এদেশটিরও তিন দিকে, তিনটি সাগরের জলরাশি। এ দেশের উত্তরে সুউচ্চ আল্পস পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ। অতীতে মিশর, কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত এশিয়া মাইনর ও গ্রীসের প্রভাব ইটালীর ওপর পড়েছিল। ইটালীর পশ্চিম উপকূলের মাঝামাঝি স্থান থেকে একটু দূরে টাইবার নদীর তীরে রোম নগরী গড়ে ওঠে। কথিত আছে রোমিউলাস নামে এক ব্যক্তি রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নাকি আন্দাজ সাতাশ শ' বছর আগে এই নগরী স্থাপন করেছিলেন। প্রবাদ এই, রোমিউলাস ও তাঁর ভাই রোমাস নাকি এক নেকড়ে বাঘিনীর স্তন্য পান করে বড় হয়েছিল। এ কাহিনী কতদূর সত্য, বলা মুস্কিল। রোম উর্বরা জমিতে অবস্থিত হওয়ায় কৃষিকাজ এখানে ভাল ভাবেই চলত। সমুদ্রের কাছে বলে ব্যবসা-বাণিজ্য করেও রোমের কম লাভ হত না।

প্রথম দিকে রোমে রাজতন্ত্র ছিল। পরে সেখানে অভিজাত ব্যক্তিদের শাসন চালু হয়। শেষ পর্যন্ত জনগণের চাপে রোমে গণতন্ত্র স্থাপিত হল।

শীঘ্রই রোম এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। রোমের নাগরিকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী, সাহসী ও বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। তাদের মনের জোর ছিল খুব বেশী। বার বার হেরে গিয়েও তারা হতাশ হয়ে পড়ত না। তাদের নিজস্ব প্রতিভা খুব একটা ছিল না। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রায়


রোমক সাম্রাজ্য
ক্যাস্পিয়ান সাগর
আর্মেনিয়া
অ্যাসিরিয়া
মেসোপটেমিয়া
পারস্য উপসাগর
আরব দেশ
কৃষ্ণ সাগর
কনস্টান্টিনোপল
এশিয়া মাইনর
সিরিয়া
প্যালেস্টাইন
ভূমধ্য সাগর
মিশর
জার্মানী
দানিয়ুব
মেসিডন
ইতালী
রোম
সিসিলি
কার্থেজ
আফ্রিকা
স্পেন
গল
ব্রিটেন

সবকিছুই অন্যদের থেকে ধার করা। গ্রীসের কাছে এ ব্যাপারে তারা খুবই ঋণী। রোমানগণ সাম্রাজ্য বিস্তার, সাম্রাজ্য শাসন ও আইন রচনার ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। প্রায় দু'শ বছর ধরে চেষ্টার পর রোমানগণ ইটালীর বেশীর ভাগ রাজ্য নিজেদের অধিকারে আনে। এবার তারা একটি বিরাট নৌশক্তির মুখোমুখি হল। এর নাম কার্থেজ।

কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ—আফ্রিকার উত্তর উপকূলে কার্থেজ শহরকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য করে এটি খুব ধনী ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ভূমধ্যসাগরের অনেক দ্বীপ ছিল কার্থেজের অধীনে। কার্থেজের বহু বাণিজ্য-পোত, রণতরী ও বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল।

ইটালীর দক্ষিণে সিসিলি ছিল কার্থেজের দখলে। এই দ্বীপটি রোম দখল করতে চাইলে উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। রোমের জনগণ ছিল আর্য জাতির লোক আর কার্থেজের বাসিন্দারা ছিল ফিনিশীয় জাতিভুক্ত। রোম ও কার্থেজের মধ্যে মোট তিনটি যুদ্ধ হয়। আজ থেকে প্রায় বাইশ শ' বছর আগে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজ পরাজিত হয়ে সিসিলি ছেড়ে চলে আসে। শীঘ্রই রোম কার্থেজের হাত থেকে সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা দ্বীপ কেড়েনেওয়ায় দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয়। কার্থেজের সেনাপতি হ্যানিবল, আল্পস পর্বত অতিক্রম করে ইটালী আক্রমণ করেন। তিনি একের পর এক যুদ্ধে রোমানদের পরাজিত করলেও রোম দখল করতে ব্যর্থ হন। রোমানগণ তখন কার্থেজ আক্রমণ করে বসে। হ্যানিবল কার্থেজে ফিরে গিয়ে তাদের বাধা দেন। কিন্তু তাঁকে শেষ পর্যন্ত জামা-র যুদ্ধে রোমান সেনাপতি সিপিও-র নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়। এই যুদ্ধের ফলে রোম, স্পেন লাভ করে এবং কার্থেজ মাত্র দশটি রণতরী রাখার অনুমতি পায়। এর ফলে ভূমধ্যসাগরে রোমের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

শীঘ্রই কার্থেজ পুনরায় সচ্ছল হয়ে ওঠে। তাই রোম তাকে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে রোম কার্থেজকে পরাজিত করে সেটিকে ধ্বংস করে দেয়। রোমের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

প্রাচীনকালে রোমের সমাজ—রোমানগণ পরিবারে বাস করত। পরিবারের কর্তার কথা অমান্য করা যেত না।

রোমের নাগরিকগণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) পেট্রিশিয়ান, (২) প্লিবিয়ান। কয়েকটি অভিজাত বংশের লোকদের পেট্রিশিয়ান বলা হত। এরা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। রাজ্য শাসনের ভার ছিল তাদেরই ওপর।

প্লিবিয়ানগণ ছিল গরীব সম্প্রদায়। তারা মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের বংশধর। বাইরে থেকে আসা নানা জাতির লোক বা ভিন্‌দেশী বণিকরাও প্লিবিয়ান বলে পরিচিত হত। প্লিবিয়ানগণ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। অথচ চাষবাস, যুদ্ধ প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ তাদেরই করতে হত। প্লিবিয়ানগণ জীবিকার জন্য পেট্রিশিয়ানদের ওপর নির্ভর করত। অধিকাংশ জমি ছিল পেট্রিশিয়ানদের হাতে।

এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিয়ে থা চলত না। প্লিবিয়ানগণ সরকারী পদগুলি থেকে বঞ্চিত ছিল। এই হীন অবস্থার প্রতিবাদে প্লিবিয়ানগণ মোট তিন বার নীরবে রোম ছেড়ে চলে যায়। তখন পেট্রিশিয়ানরা ভয়ে তাদের নানা সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। উভয় শ্রেণীর মধ্যে এবার বিবাহ আইনসিদ্ধ হল। সরকারের বড় বড় পদে এবং শাসন পরিষদ বা সেনেটে নিযুক্ত হবার অধিকারও তারা পেল। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি ব্যবস্থাও নেওয়া হল। প্রাচীন রোমের সমাজে অনেক ক্রীতদাস ছিল। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়।

রোমের নাগরিকত্ব—রোম যত ধনী ও শক্তিশালী হল, ততই তার নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোমের শাসকরা সাধারণতঃ পরাজিত দেশগুলির জনগণকে রোমের নাগরিক করে নিত। সেযুগে রোমের নাগরিকত্ব লাভ অত্যন্ত সম্মানজনক বলে মনে করা হত। তাই নূতন নাগরিকরা রোমের খুবই অনুগত থাকত।

ক্রীতদাস—রোমেরশাসকরা নানা দেশজয় করে বহু বন্দী ও বন্দিনীকে রোমে নিয়ে আসে। এদের বলা হত ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী। অনেক

সময় দাসদের বাজার থেকেও কেনা হত। মাঝে মাঝে এদের প্রতি কেউ ভাল ব্যবহার করলেও এদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। মালিক এদের নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারত। দাসদাসীদের দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করান হত। তারা মুখ বুঁজে নানা অত্যাচার সহ্য করত। অনেক সময় লোকেদের আনন্দ দেবার জন্য তাদের হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই করে বা মল্লযুদ্ধ করে মরতে হত। এ সকল কারণে ক্রীতদাসরা রোমানদের উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তারা প্রায়ই বিদ্রোহ করত। প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোমের



ক্রীতদাসদের মল্লযুদ্ধ

ক্রীতদাসগণ স্পার্টাকাস নামে এক মল্লযোদ্ধা বা গ্ল্যাডিয়েটর-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। রোমান সৈন্যগণ বার বার তাদের কাছে পরাজিত হয়েছিল স্পার্টাকাস সারা ইটালীতে ব্যাপক ধ্বংস-লীলা চালান। শেষ পর্যন্ত রোম বিদ্রোহী দাসদের নিষ্ঠুর ভাবে দমন করে। বন্দী স্পার্টাকাস নিহত হন এবং দু' হাজার ক্রীতদাসকে রাস্তার ধারে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। সেনাপতি মার্কাস ক্রেসাস ও পম্পি ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ চূর্ণ করেছিলেন।

গণতান্ত্রিক রোম এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। ইউরোপে বৃটেন, স্পেন, গল বা ফ্রান্স, বল্কান অঞ্চল ও গ্রীস তার দখলে আসে এশিয়া মহাদেশের এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ও আফ্রিকার মিশর, কার্থেজ প্রভৃতি স্থান রোমের অধিকারভুক্ত হয়। এত বড় সাম্রাজ্য ভাল ভাবে শাসন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। রোমের শাসন-পরিষদ (সেনেট)

রাজ্য জয় ও শাসনের ব্যাপারে বড় বড় সেনাপতির ওপর নির্ভর করতে থাকে। ধীরে ধীরে এই সেনাপতিরা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তাঁদের কেউ কেউ কিছু সময়ের জন্য ডিক্টেটর বা সর্বশক্তিমান অধিনায়কের পদে নিযুক্ত হন। সেনাপতি সুলা ও জুলিয়াস সীজার ছিলেন এরূপ ডিক্টেটর।

জুলিয়াস সীজার—জুলিয়াস সীজার রোমের এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জনসাধারণের প্রতি তাঁর খুব সহানুভূতি ছিল। এজন্য তিনি রোমে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। জুলিয়াস সীজার সুশিক্ষিত, সুবক্তা ও প্রতিভাবান সেনাপতি ছিলেন। স্পেনের যুদ্ধে তিনি তাঁর সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন। সেনেট তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি বলে তিনি তার শত্রুতে পরিণত হন। তিনি শীঘ্রই রোমের কনসাল পদ লাভ করেন। সীজার, পম্পি ও ক্র্যাসাস নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব করে রোমের কর্তা হয়ে বসলেন। সীজার গল ও ব্রিটেন জয় করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সেনেট পম্পিকে হাত করে সীজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু সীজার অনায়াসেই পম্পিকে পরাজিত করেন। এর পর তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ান। এই সময় থেকেই রোমে গণতন্ত্রের পতন শুরু হয়। গণতন্ত্রের ভক্তরা গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য সীজারকে হত্যা করল। কিন্তু শীঘ্রই সীজারের ভাইপো ও পালিত পুত্র অক্টেভিয়াস রোমের কর্তা হয়ে বসলেন। তিনিই রোমের প্রথম সম্রাট। তিনি গণতন্ত্রীদের পরাজিত করে রোমান গণতন্ত্রের পতন ঘটালেন।

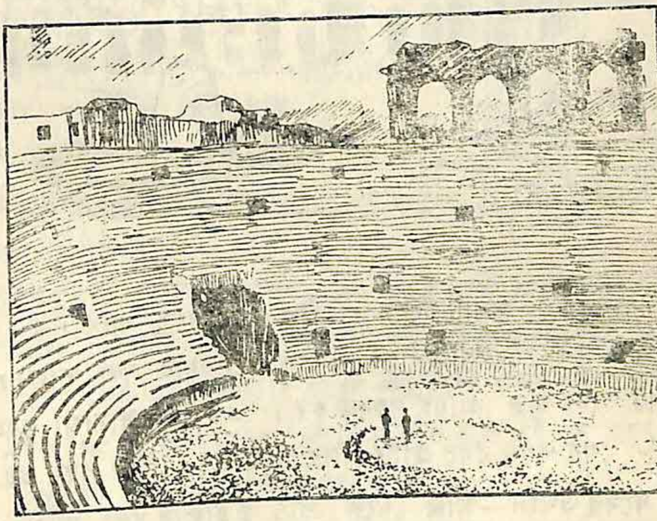


জুলিয়াস সীজার

আগে রোমের সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু সম্রাট ছিল না। এবার সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন একজন সম্রাট। অক্টেভিয়াস অগাস্টাস নামেও পরিচিত ছিলেন।

অগাস্টাসের পরবর্তী সম্রাটগণ পাঁচশ বছরেরও বেশী সময় ধরে রোমে রাজত্ব করেন। ভাল সম্রাটদের মধ্যে টিটাস, ট্রাজান, হ্যাড্রিয়ান, মার্কাস অরেলিয়াস, কনস্ট্যানটাইন প্রভৃতির নাম করতে হয়। ক্যালিগুলা, নিরো প্রভৃতি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্বর জাতির আক্রমণে রোমের পতন ঘটে। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলে (তুরস্ক দেশের ইস্তাম্বুল নগর) রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ আরও প্রায় এক হাজার বছর ধরে টিঁকে ছিল।

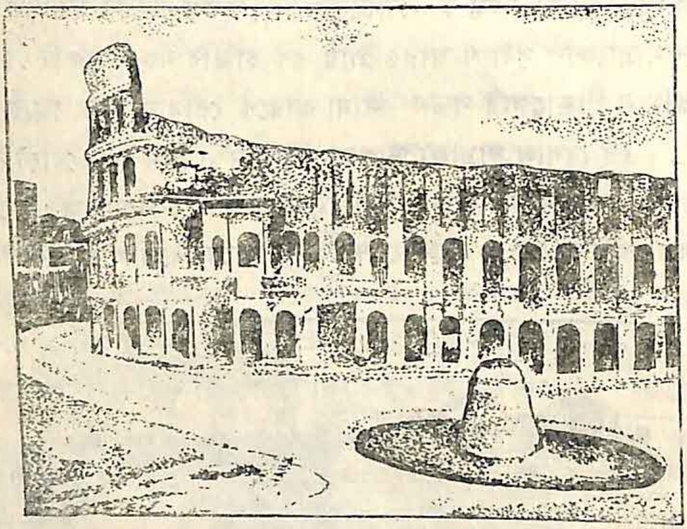
রোমান সাম্রাজ্যের পতন—নানা কারণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ১। এই বিশাল সাম্রাজ্য ভালভাবে শাসন ও রক্ষা করা মোটেই সহজ ছিল না। ২। অনবরত যুদ্ধের ফলে রোম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রোমের লোকক্ষয়ও কম হয়নি ৩। নানা দেশ থেকে রোমে প্রচুর খাদ্য, বিলাসদ্রব্য,



অ্যাম্ফি থিয়েটার

ধনরত্ন ও ক্রীতদাস আসত। এর ফলে জনগণ ক্রীতদাসদের ওপর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আরাম ও বিলাসে গা ঢেলে দেয়। তাদের জন্য তৈরী হল অজস্র প্রেক্ষাগৃহ। এগুলিতে পশুতে পশুতে, পশুতে মানুষে, এবং মল্ল যোদ্ধাদের মধ্যে লড়াই দেখান হত। রক্তপাত ও হত্যা ছিল এখানকার নিত্যকার ঘটনা। এই প্রেক্ষাগৃহগুলির নাম ছিল অ্যাম্ফি থিয়েটার (খোলা স্থানে অবস্থিত

রঙ্গমঞ্চ) এবং কলোসিয়াম। কলোসিয়াম ছিল একটি বিশাল প্রেক্ষাগৃহ। এখানে বহু লোকের বসার স্থান ছিল। এখানে বহু মল্লযুদ্ধ ও পশুর লড়াই অনুষ্ঠিত হত। জনগণের চরিত্রের অধঃপতন ঘটায় সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ৪। সম্রাটগণ দুর্বল হয়ে পড়ায় সৈন্যবাহিনী প্রধান হয়ে



কলোসিয়াম

ওঠে। সৈন্যরাই কে সম্রাট হবেন তা ঠিক করে দিতে থাকে। ৫। বর্বর জাতিগুলি থেকে সৈন্যবাহিনীতে লোক নেওয়ার ফল ভাল হয়নি। ৬। সম্রাট পদের জন্য প্রায়ই গৃহযুদ্ধ হত। এর ফলে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ৭। শেষ পর্যন্ত বর্বর জাতিগুলির আক্রমণে রোমের পতন হয়।

খ্রীষ্ট ধর্মের উত্থান—আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে জুডার (প্যালেস্টাইনের) বেথল্‌হেম নগরে যীশুখ্রীষ্টেরজন্ম হয়। তাঁর পিতা জোসেফ ও মাতা মেরী ছিলেন গরীব ইহুদী। যীশু নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ ও পুত্র বলে প্রচার করেন। তিনি এক ঈশ্বরের আরাধনা করতে বলতেন। তিনি ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা ও অহিংসার বাণী প্রচার করেন। যীশু ছিলেন গরীব, অক্ষম ও পাপী-তাপীর বন্ধু। গল্পচ্ছলে দেওয়া তাঁর উপদেশগুলি বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম

খ্রীষ্ট ধর্ম। ইহুদী পুরোহিতরা যীশুকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলে মনে করত না। যীশুখ্রীষ্ট, ইহুদী পুরোহিতদের অনেক রীতি-নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন। এজন্য তারা যীশুর উপর অত্যন্ত • সন্তুষ্ট হয়। তারা তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। যীশু সুদখোর ও ঠক ব্যবসাদারদের নিন্দা করতেন। শীঘ্রই যীশুর এক শিষ্য জুডাস ইস্‌কারিয়ট টাকার লোভে যীশুকে তাঁর শত্রুদের হাতে তুলে দেয়। ইহুদীদের অনুরোধে জুডার রোমান শাসক যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মারার আদেশ দেন। জুডা তখন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য সাধু পল প্রভৃতি রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্ট ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন।


ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট

রোমানগণ সম্রাটদের দেবতা বলে মনে করত। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ এক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে দেবতা বলে মানত না এজন্য রোমের সম্রাটগণ খ্রীষ্টানদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু করেন। কিন্তু এত অত্যাচার করেও খ্রীষ্টানদের দমন করা গেল না। ক্রীতদাস ও গরীব সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে এই ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এই ধর্ম তাঁদের মনে শান্তি এনে দিত।

খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় বুদ্ধিমান সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন খ্রীষ্ট ধর্মকে বৈধ বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর সময় থেকে এই ধর্মই রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র-ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। কিছুদিনের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর বহু লোক এই ধর্মে বিশ্বাসী।

(ঘ) বিভাগ

চীন : বিভিন্ন রাজবংশ

আগে আমরা চীনের নদ-নদী ও পুরাণ-কথা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। এখন সেদেশের কয়েকটি রাজ-বংশ নিয়ে দুচার কথা বলা যাক। মহান শাং রাজবংশের সময় থেকেই ইতিহাস মোটামুটি নির্ভরযোগ্য হয়েওঠে। আজ থেকে প্রায় সাঁইত্রিশ শ' বছর আগে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। শাং বংশ ইন্ বংশ নামেও পরিচিত। এই বংশের প্রথম রাজার নাম ট্যাং।

শাং বংশের রাজ্য খুব একটা বড় ছিল না। রাজ্যের রাজধানী ছিল আনিয়াং শহরে। এই শহরের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে শাং যুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ সময় চীনের প্রধান শস্য ছিল জোয়ার। সম্রাটগণকে কর হিসাবে শস্যই দেওয়া হত। এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ প্রসার হয়। এসময় মুদ্রা হিসাবে কড়ি ব্যবহার হত। রেশম ছিল প্রধান পণ্যদ্রব্য। এই যুগে ব্রঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার হত বলে জানা গেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও বিলাস-দ্রব্য প্রধানত ব্রঞ্জ দিয়েই তৈরী হত। শাং যুগের চিত্রিত মাটির পাত্রগুলি ভারি সুন্দর। শাং যুগের ধ্বংসাবশেষ থেকে বহু কচ্ছপের খোলা পাওয়া গেছে। এতে নানা পশুপাখী ও শিকারের চিত্র এবং এক ধরনের লেখা দেখা যায়।

এ সময়ের চীনারা বহু দেবদেবীর ও পিতৃপুরুষের পূজা করত বলে জানা গেছে। এই বংশের পর চীনে চৌ বা জৌ রাজবংশ স্থাপিত হয়। জমিদার বা সামন্ত-প্রভুরা তখন খুব ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।

চৌ যুগে চীনে বিদ্যাচর্চার খুব প্রসার ঘটে। এ সময়ে বহু বিদ্বান ও দার্শনিকের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে লাওৎসি, কনফুশিয়স, মেন্‌সিয়াস, প্রভৃতি বিখ্যাত।

কনফুশিয়স—আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চীনের চুফু নগরে কনফুশিয়স বা কুং চিউ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাছাকাছি সময়ে ইরানে জরথুস্ত্র, ভারতবর্ষে মহাবীর ও বুদ্ধদেব এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরও অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। কনফুশিয়সের সময় সামন্তগণের অত্যাচারে দেশের লোক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কনফুশিয়স রাজা, প্রজা সকলকে ভদ্র, কর্তব্য-পরায়ণ ও সচ্চরিত্র করে তুলে দেশে শান্তি আনার চেষ্টা করেন।



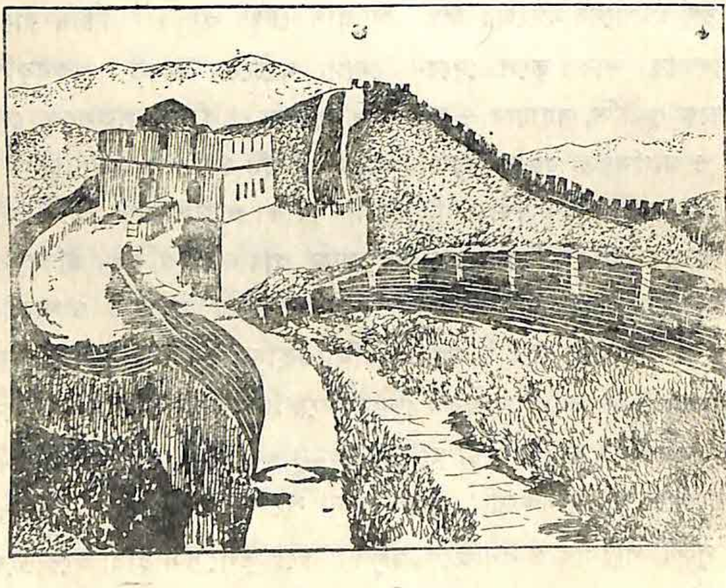
কনফুশিয়স

কনফুশিয়স মানুষকে অন্য লোকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলতেন। তাঁর মতে, আদর্শ রাজার কাজ হল জনগণের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। তিনি রাজ্যের পরিচালনার ভার তুলে দেবেন যোগ্য মন্ত্রীদের হাতে। কনফুশিয়স জনগণকে সুনীতি, সদাচার ও কর্তব্য শিক্ষা দেন। তিনি সকলকে লোভ, হিংসা ও স্বার্থপরতা বর্জন করতে বলতেন। তিনি ছাত্রদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এই সকল গুণ শিক্ষা দিতেন। বোকা ও অলসদের তিনি একদম পছন্দ করতেন না। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে প্রধানতঃ কবিতা, ইতিহাস ও সদাচার নিয়ে আলোচনা করতেন। পুরনো কালের সদাচার ও শালীনতা ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি কিছুদিন সুনামের সঙ্গে রাজকর্মও করেছিলেন। পরে এই রাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন। বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কনফুশিয়স ইতিহাস, কাব্য, নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। চীনের এই অসাধারণ জ্ঞানী পুরুষ, পরিবার ও সমাজকে সুশৃঙ্খল করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এখনও চীন দেশের বহু লোক তাঁকে দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকে।

চৌবংশের পতন ঘটিয়ে চি'ন অঞ্চলের সামন্তপ্রভু ওয়াং চেং চীনের

সিংহাসনে আরোহণ করেন। চীনে তিনিই নিজেকে সর্বপ্রথম সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর নূতন নাম হল সি-হুয়াং তি। নূতন সম্রাট সামন্ত-প্রভুদের দমন করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তিনি অনেক নূতন রাজ্যও জয় করেছিলেন। সম্রাট চি'ন সাম্রাজ্যকে চল্লিশটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি বিভাগের শাসনভার দেওয়া হয় একজন শাসনকর্তার ওপর। সম্রাট সি-হুয়াং শাসন ব্যবস্থার ওপর কড়া নজর রাখতেন। তিনি ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যের নানা স্থান ঘুরে প্রজাদের অবস্থা জেনে নিতেন। সামন্তপ্রভু ও প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ তাঁর নূতন ধরনের শাসন ব্যবস্থার নিন্দা করতে থাকেন। এঁরা ছিলেন পুরনো রীতি-নীতিতে বিশেষ করে কনফুশিয়সের নীতি-ধর্মে বিশ্বাসী। মন্ত্রী লি-স্যু-র পরামর্শে সম্রাট এই সকল পণ্ডিতদের প্রিয় গ্রন্থগুলি পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। এইভাবে চীনের বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায়।

সম্রাটের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল চীনের উত্তর দিকে পাহাড়ী জমিতে এক বিশাল প্রাচীর বা দেওয়াল নির্মাণ। হূণ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতির



চীনের প্রাচীর

আক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই অঞ্চলে আগে

থেকেই কিছু কিছু প্রাচীর ছিল। সম্রাট এগুলিকে জুড়ে দিয়ে তার দৈর্ঘ্য অনেক বাড়িয়ে দিলেন। বর্তমানে চীনের প্রাচীর লম্বায় প্রায় সাড়ে বাইশ শ' মাইল (৩৬০০ কিলোমিটার)। এটি পনেরো থেকে কুড়ি ফুট উঁচু (৪.৬১৬ মিটার)। এই প্রাচীরে ত্রিশ হাজার গম্বুজ রয়েছে। এখানে সৈন্যরা সর্বদা পাহারা দিত। সেনাপতি মেং তিয়ন-এর পরিচালনায় তিন লক্ষ সৈন্য এই প্রাচীর নির্মাণে নিযুক্ত হয়েছিল। চীনের এই প্রাচীরকে পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের একটি বলা হয়ে থাকে।

সম্রাট সি-হুয়াং তি চীনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয়-শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি বহু রাস্তাঘাট তৈরী করেছিলেন। প্রাচীন বিধি-বিধান-এর পরিবর্তে তিনি নূতন বিধি-বিধানের সূচনা করেন। তবে তাঁর সমালোচকদের নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়ে তিনি অসংখ্য শত্রুও সৃষ্টি করেন। তাই তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বংশের পতন ঘটে।

(ঙ) বিভাগ

ভারতবর্ষের কথা

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ ঘটে সিন্ধু সভ্যতায়। এ বিষয়ে আগে অনেক কথা বলা হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতা ছিল তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা। এই সভ্যতার পতনের পর ভারতে লৌহ যুগের সূত্রপাত ঘটে। এ সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল বিদেশী আর্য জাতি। এরা সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়া থেকে ইরান ও ভারতবর্ষে এসেছিল। পণ্ডিতদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে আসে। তারা উত্তর-পশ্চিম দিকের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। তাদের ভাষার নাম ছিল আর্য। আর্য জাতি লোহার অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়ার ব্যবহার জানত। তারা ঘোড়ার পিঠে চেপে এবং ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করত। সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টা দ্রাবিড়গণ আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যায়। যাযাবর, আধাসভ্য আর্যরা দ্রাবিড়দের নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়ে এদেশে বসবাস করতে থাকে। প্রথমে তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং পাঞ্জাবের

সাতটি নদীর উপত্যকায় বাস করত। একে বলা হত সপ্তসিন্ধু। পরে তারা ধীরে ধীরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

বেদ—আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। এর অর্থ জ্ঞান। তাদের মতে, বেদে ঈশ্বরের বাণী ধরা আছে। মুনি-ঋষিরা এই বাণী শুনেছিলেন। তাই বেদের আর এক নাম শ্রুতি। প্রথম দিকে বেদ লেখা হয়নি। বেদের বাণী-গুলি মুখস্থ করে রাখা হত। বেদ প্রধানতঃ পদ্যে রচিত। বেদে দেবদেবীর বন্দনা, যাগযজ্ঞের নিয়মকানুন প্রভৃতি রয়েছে। বেদ চারিটি—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। ঋক্ বেদ সব থেকে প্রাচীন। সাম ও যজুর্বেদের বেশীর ভাগ মন্ত্রই ঋক্ বেদ থেকে নেওয়া। অথর্ব বেদে বিপদ-আপদ দূর করার নানা উপায়, শত্রুকে বশ করা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে।

বেদের আমলে সমাজ—আর্যরা প্রথম দিকে গ্রামে বড় পরিবারে বাস করত। পরে তারা নগরে বাস করতে শেখে। চাষবাস, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। পরিবারের কর্তার কথা সকলেই মেনে চলত। চাষের জন্য প্রতিটি পরিবারেরই কিছু জমি ছিল। যব, চাল, দুধ, মাংস, ও ফলমূল আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল। সোমলতার রস থেকে মদ তৈরী হত। এটি তাদের খুব প্রিয় ছিল। তারা চামড়া, পশম ও সূতার পোশাক ব্যবহার করত।

সমাজে মেয়ের চেয়ে ছেলের আদরই ছিল বেশী। তবে মেয়েদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হত না। মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মেলামেশা করতে পারত। অনেক মহিলা বিয়ে-থা না করে সারা জীবন পড়াশোনা করেই কাটিয়ে দিতেন। প্রথম দিকে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। জনগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি জাতি বা বর্ণে ভাগ করাকেই জাতিভেদ প্রথা বলা হয়। খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ ও পেশায় কোন বিধি-নিষেধ থাকত না। শিকার, গানবাজনা ও পাশাখেলা এ যুগের প্রধান আমোদ-প্রমোদ ছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা—কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম গড়ে উঠত। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত একটি 'বিশ' বা 'জন'। বিশ বা জনের অধিপতিকে বলা হত রাজা। প্রজারা সাধারণতঃ রাজা নির্বাচন করত।

মান্যগণ্য লোকদের একটি সভা এবং প্রজাদের একটি সমিতি রাজাকে নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিত। রাজা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রজাদের রক্ষা করতেন। বিনিময়ে প্রজারা উৎপন্ন শস্যের এক অংশ রাজাকে কর হিসাবে দিত। এর নাম ছিল বলি। রাজার কর্মচারীদের মধ্যে পুরোহিত, গ্রামণী (গ্রামের মোড়ল), সেনানী (সেনাপতি) ও গুপ্তচর উল্লেখযোগ্য। রাজার অধীনে একটি সৈন্যবাহিনীও ছিল।

ধর্ম—আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবদেবী বলে মনে করত। বেদের যুগে আকাশের দেবতা ছিলেন দ্যৌঃ, বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, জলের দেবতা বরুণ এবং আলোর দেবতা সূর্য। অগ্নিও একজন প্রধান দেবতা ছিলেন দেবীদের মধ্যে উষা, পৃথ্বী, সরস্বতী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। আর্যগণ ঐসব দেবদেবীর স্তবস্তুতি করত, তাঁদের উদ্দেশ্যে নানা সুখাদ্য ও পানীয় দিত। বেদীতে আগুন জ্বেলে ঘি, দুধ, শস্য প্রভৃতি আহুতি দেওয়ার নিয়ম ছিল। একে বলা হত যজ্ঞ। যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হত। আর্যদের ধর্মকর্মের উদ্দেশ্য ছিল দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করে সুখ ও সম্পদ লাভ করা। তারা মূর্তিপূজা করত না।

মহাকাব্য—বৈদিক যুগে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। এগুলিতে ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ছিল। পরবর্তীকালে এগুলির ওপর ভিত্তি করেই দুটি মহাকাব্য রচিত হয়। এদের নাম রামায়ণ ও মহাভারত। বাল্মীকিকে রামায়ণের রচয়িতা এবং বেদব্যাসকে মহাভারতের রচনাকার বলে মনে করা হয়। রামায়ণের মূল কাহিনী এই ঃ অযোধ্যার রাজা দশরথের আদেশে তাঁর বড় ছেলে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যান। তাঁর সঙ্গে যান তাঁর স্ত্রী সীতা ও ছোট ভাই লক্ষ্মণ। লঙ্কার রাজা দুষ্ট রাবণ সীতাকে চুরি করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাম-লক্ষ্মণ তখন কিষ্কিন্ধ্যার বানর নামে এক অনার্য জাতির সাহায্যে লঙ্কা আক্রমণ করেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হন। রাম সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

মহাভারতের গল্পটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ হস্তিনাপুরের কুরুবংশীয় রাজা ছিলেন দুর্যোধন। তাঁর পিতার নাম ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কৌরব নামে

পরিচিত। দুর্যোধন তাঁর কাকা পাণ্ডুর পাঁচ ছেলেকে (পঞ্চ পাণ্ডব) রাজ্য থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেন। এর ফলে দুই পক্ষের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধে। দ্বারকার নেতা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডুর ছেলেরা অর্থাৎ পাণ্ডবগণ জয়ী হন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব পঞ্চপাণ্ডব নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে অর্জুন ছিলেন মহাবীর। পণ্ডিতদের মতে, আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটেছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোর হয়ে ওঠে। সমাজে ব্রাহ্মণদের চেয়ে ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। এই যুগের লোকেরা বীর, সৎ ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। কিন্তু তাদের চরিত্রে নিষ্ঠুরতা, লোভ, রাগ, শঠতা প্রভৃতি দোষেরও অভাব ছিল না।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম—আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের পূর্বদিকে দুটি নূতন ধর্মের সৃষ্টি হয়। এদের নাম জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। প্রথমটির প্রধান প্রচারকের নাম মহাবীর। দ্বিতীয়টি প্রচার করেন বুদ্ধদেব। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই ছিল বেদ-এর বিরোধী।

এই সময় বেদের ধর্ম খুব জটিল ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। সাধারণ লোক এই ধর্মে কোন অংশ নিতে পারত না। এই সময়ে যাগযজ্ঞে প্রচুর পশুবলি দেওয়া হত বলে বহু লোক বিরক্ত হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা নিজেদের দেবতা বলে প্রচার করতেন বলেও প্রতিবাদ ওঠে। শেষপর্যন্ত গ তান্ত্রিক বৈশালী ও শাক্য রাজ্যে যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল বলেই বেদ ও ব্রাহ্মণ বিরোধী এই দুই ধর্মের উত্থান সম্ভব হয়েছিল। এ-ও মনে রাখতে হবে যে. পূর্ব ভারতে বৈদিক ধর্মের প্রভাব কখনই খুব গভীর ভাবে পড়েনি। তাই বেদ-বিরোধী ধর্ম এই অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

মহাবীর ও বুদ্ধদেবের সময় উত্তর ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। তাই জনসাধারণের দুর্দশার সীমা ছিল না। মহাবীর ও বুদ্ধদেব এই দুঃখময় জগৎ থেকে তাদের মুক্তি পাবার উপায় দেখান। তাঁরা জনগণকে কামনা-বাসনা ও মায়া কাটাতে উপদেশ দেন। তাহলে তাদের আর এই পৃথিবীতে জন্মাতে হবে না।

মহাবীরের ধর্মমত—মহাবীরের আগে জৈনধর্ম আরও অনেকে প্রচার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পার্শ্বনাথ-এর নাম বিখ্যাত। মহাবীর বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পার্শ্বনাথের ধর্মমতকেই সুগঠিত করেছিলেন। মহাবীর তাঁর শিষ্যদের ইন্দ্রিয়গুলি জয় করতে বলেন। কর্মের ফলেই মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। সৎভাবে থাকলে কর্মফল ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাঁর মতে দেহকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে মৃত্যুবরণ করা উচিত। তিনি সকলকে হিংসা বর্জন করতে বলতেন। পৃথিবীর সব বস্তুই চেতনাযুক্ত বলে তিনি মনে করতেন। পাটনা জেলার পাবা-তে তিনি দেহত্যাগ করেন।



মহাবীর



বুদ্ধদেব

শাক্য রাজ্যের কপিলাবাস্তু (কপিলাবস্তু অশুদ্ধ) নগরের কাছে লুম্বিনী গ্রামে গৌতম বা সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোদন। বিলাস ব্যসনে মানুষ হলেও তিনি শীঘ্রই সন্ন্যাসী হয়ে যান। মানুষকে দুঃখের হাত থেকে বাঁচাবার পথ আবিষ্কার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামে এক জায়গায় এক অশত্থ গাছের নীচে বসে তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তিনি এখানে বসেই দুঃখজয়ের উপায় আবিষ্কার করেন। তখন তাঁর নাম হল বুদ্ধ বা জ্ঞানী।

বুদ্ধদেবের ধর্মমত—বুদ্ধদেবের মতে, সমস্ত দুঃখের মূলে আছে কামনা-বাসনা। আটটি উপায়ে কামনা-বাসনা জয় করা যায়। এগুলি হল সৎ বাক্য, সৎকর্ম, সৎ সংকল্প, সৎ চেষ্টা, সৎ জীবন, সৎস্মৃতি, যথার্থ দৃষ্টি ও যথার্থ ধ্যান। এগুলি আয়ত্ত করলে মানুষ নির্বাণ বা মুক্তি পাবে। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের মিথ্যা, অন্যায়, অসৎ আচরণ, চুরি ও জীবহিংসা ত্যাগ করতে বলেন। এগুলিকে পঞ্চশীল বলা হয়। বুদ্ধদেব মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি সকলকে খুব বেশী ত্যাগ বা খুব বেশী ভোগ করতে নিষেধ করতেন। তাঁর মতে মাঝামাঝি পথে থাকাই ভাল।

বুদ্ধদেবের নির্দেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মঠে বা সঙ্ঘে বাস করতেন। অল্প কালের মধ্যেই ভারত ও ভারতের বাইরে বহু দেশে বৌদ্ধধর্ম খুব জনপ্রিয় হয়। বুদ্ধদেব আশী বছর বয়সে কুশীনগরে প্রাণত্যাগ করেন।

সাম্রাজ্য পর্ব

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে উত্তর ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। প্রাচীন পুঁথি পুস্তকে এদের সংখ্যা ষোল বলা হয়েছে। হয়ত এদের সংখ্যা আরও বেশী ছিল। এই যুগ ষোড়শ মহাজনপদ বা ষোলটি রাষ্ট্রের যুগ নামে খ্যাত। কালক্রমে এই রাজ্যগুলির একটি, মগধ রাজ্য অন্য রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্তমান বিহার প্রদেশের দক্ষিণ অংশে এই মগধ রাজ্য অবস্থিত ছিল। মহাপদ্মনন্দ নামে এক রাজা মগধ রাজ্যটিকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁর বংশের নাম নন্দবংশ। এই নন্দবংশকে বিতাড়িত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসন দখল করেন এ ঘটনা ঘটে আজ থেকে তেইশ শ' বছর আগে। এই ব্যাপারে তাঁকে চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত যথেষ্টসাহায্য করেছিলেন।

মৌর্য সাম্রাজ্য—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দিগ্বিজয়ীবীর ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের গ্রীক সৈন্যদের বিতাড়িত করে তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব অধিকার করেন। সিরিয়ার রাজা সেলুকস ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে পরাজিত করেন। এর ফলে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্তান চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত হয়। চন্দ্রগুপ্তের এক বিশাল সৈন্য ও নৌ-বাহিনী ছিল। এর

সাহায্যে তিনি প্রায় সারা ভারত জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক, পূবে বাংলা থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র এবং উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়ার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তন করেন। এ কাজে তাঁকে অজস্র কর্মচারী ও গুপ্তচর সাহায্য করত। তিনি ছিলেন প্রজাদরদী ও ন্যায় বিচারক। এসময় অপরাধীকে



কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। সেলুকসের দূত মেগাস্থেনিস দীর্ঘকাল ধরে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ছিলেন। তাঁর রচিত কাহিনী থেকে চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। এ ব্যাপারে কৌটিল্যের পুস্তক অর্থশাস্ত্রও আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার রাজা হন। সম্ভবত তিনি নূতন কোন রাজ্য দখল করেন নি। বিন্দুসারের পুত্র অশোক রাজা হয়ে ভারতের পূব দিকে অবস্থিত কলিঙ্গ রাজ্য বা বর্তমান উড়িষ্যা জয় করেন। এই যুদ্ধে বহু কলিঙ্গবাসী আহত ও নিহত হয়। এই দৃশ্য দেখে অশোকের মনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি আর কোনদিন যুদ্ধ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁর আগে পরে পৃথিবীর আর কোন রাজা এ ধরনের প্রতিজ্ঞা করেন নি। শীঘ্রই তিনি অহিংস বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। সেবা ও প্রীতির দ্বারা মানুষের মন জয় করাই এখন তাঁর প্রধান কাজ হল। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম থেকে কতকগুলি নীতিবাক্য নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। এ ব্যাপারে তাঁকে রজ্জুক, ধর্মমহাপাত্র প্রভৃতি কর্মচারী সাহায্য করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের সৎ জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা। তাঁর রাজ্যে পাহাড়-পর্বত, স্তম্ভ ও গুহার গায়ে নীতিবাক্যগুলি খোদাই করে দেওয়া হয়। এগুলি পড়ে জনগণ বেশ উপকৃত হত। এগুলির নাম শিলালিপি, স্তম্ভলিপি ও গুহালিপি। তিনি এই নীতিবাক্যগুলি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই নীতিবাক্যগুলি অশোকের ধর্ম নামে পরিচিত। এগুলির মূল কথা হল, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, দাসদাসীর প্রতি ভাল ব্যবহার, দয়া, দান, পবিত্রতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণ অর্জন এবং হিংসা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অহংকার প্রভৃতি দোষের বর্জন।

অশোক তাঁর প্রজাদের সন্তানের মত ভালবাসতেন। তাদের সুবিধার জন্য তিনি পথঘাট তৈরী করেন, পথের পাশে কুয়ো খুঁড়ে পথিকদের তৃষ্ণা দূর করার ব্যবস্থা করেন এবং তাদের আশ্রয়ের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। অশোকের নির্দেশে রাজ্যে বহু হাসপাতালও নির্মিত হয় অশোক সাম্রাজ্যে এই ধরনের আইন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি দীন-দুঃখীদের সাহায্য করতেন, ন্যায় বিচারের দিকে দৃষ্টি দিতেন এবং গুপ্তচরদের সাহায্যে প্রজাদের অবস্থার কথা জেনে নিতেন। সম্রাট অশোক বহু বৌদ্ধমঠ, বিহার প্রভৃতিও নির্মাণ করেন। বিশ্বের সকল মানুষের প্রতিই তাঁর প্রীতি ছিল। তাই পৃথিবীর বহু লোক এখনও অহিংস সম্রাট অশোকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে। তিনি একটির বেশী নূতন রাজ্য জয় করেন নি। কিন্তু তিনি বহু

লোকের হৃদয় জয় করেছিলেন। অশোক ভারতের শান্তি ও মৈত্রীর বাণীকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। নানা গুণের জন্য তাঁকে মহামতি অশোক বলা হয়ে থাকে।

অশোকের পর মৌর্য বংশে খুব শক্তিশালী রাজা কেউ জন্মান নি। ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যে পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। সিংহাসনের জন্য প্রায়ই রাজপুত্রদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেত বলে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁরা মৌর্য সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। শীঘ্রই চার দিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচার ও মঠ প্রভৃতির নির্মাণে প্রচুর ব্যয় করায় রাজ কোষও শূন্য হয়ে পড়েছিল। এটিও সাম্রাজ্যের দুর্বলতার একটি কারণ। এই অবস্থায় আফগানিস্তান থেকে গ্রীক এবং মধ্য এশিয়া থেকে শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি বার বার মৌর্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। দুর্বল সম্রাটগণ তাদের বাধা দিতে ব্যর্থ হন। এই অবস্থায় শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সিংহাসনে বসেন। তাঁর বংশের নাম শুঙ্গ বংশ। পুষ্যমিত্র সাময়িক ভাবে গ্রীক আক্রমণ ঠেকাতে পেরেছিলেন। শুঙ্গ বংশের পর মগধে কাণ্ববংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশগুলি তেমন শক্তিশালী ছিল না।



অশোক ও তাঁর ব্রাহ্মীলিপি

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীকরাজ ডিমিট্রিয়স ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু এটি বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। আর একজন গ্রীক বীর মিনাণ্ডার পাটলিপুত্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায়। গ্রীকদের পর শকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম ভারতে রাজ্য বিস্তার করে। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশীয় রাজারা দীর্ঘকাল ধরে শকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শকদের পরাজিত করেন। এই রাজারা দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন

করেছিলেন। বিদেশী পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কিছুকাল রাজত্ব করে। এই যুগে কলিঙ্গরাজ খারবেল উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বহু স্থান দখল করে কিছুকালের জন্ম এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন।

কুষাণ বংশ—পহ্লবদের পর চীনের বাসিন্দা ইউ-চি জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এদের আর এক নাম কুষাণ। কুষাণ বংশের রাজা প্রথম কদ্‌ফিস উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ দখল করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদ্‌ফিস বর্তমান উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকেই নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় কদ্‌ফিসের একজন শাসনকর্তা সবাইকে হারিয়ে রাজা হয়ে বসলেন। তাঁর নাম কণিষ্ক। তিনি কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত এবং পশ্চিমে মধ্য এশিয়া থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল পশ্চিম ভারতের কিছু স্থানও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ারে। জীবনের শেষ দিকে কণিষ্ক চীনের সেনাপতি পান-চাও-এর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

কণিষ্কের খ্যাতি দিগ্বিজয়ের জন্য নয় বৌদ্ধধর্মের প্রচারক হিসাবেই তিনি অমর হয়ে আছেন। যে সকল বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা করতেন তাঁদের বলা হত মহাযানী। মূর্তিপূজার বিরোধীরা হীনযানী নামে পরিচিত। কণিষ্ক মহাযানীদের মত সমর্থন করতেন। তাঁর রাজত্বকালে কাশ্মীর বা পাঞ্জাবে বৌদ্ধদের এক বিশাল সম্মেলন হয়। এর নাম চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি। কণিষ্ক নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্য ধর্মের দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর উৎসাহে তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ ও জাপানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়।

কণিষ্কের রাজসভায় বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, পণ্ডিত বসুমিত্র, দার্শনিক নাগার্জুন ও চিকিৎসক চরক-এর নাম করতেই হয়। কণিষ্ক শকাব্দের প্রচলন করেন। তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন। এই তারিখ থেকেই শকাব্দ গণনা করা হয়। পরবর্তীকালে শক জাতি কণিষ্কের অব্দ দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করত

বলে এই অব্দ শকাব্দ নামে পরিচিত হয়। কণিষ্কের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাঁর সময় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল এবং প্রজারা সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাত। কণিষ্কের মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই কুষাণ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

গুপ্তবংশ—কুষাণদের পতনের পর পূর্বভারতে একটি শক্তিশালী দেশীয় রাজবংশ স্থাপিত হয়। এটি গুপ্ত বংশ নামে পরিচিত।

প্রায় তেইশশ' বছর আগে এই বংশের তৃতীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বাংলাদেশের একাংশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের কিছুটা অধিকার করেন। গুপ্তদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত তিনি উত্তর ভারতের ন'টি এবং দক্ষিণ ভারতের বারটি রাজ্যের রাজাদের পরাজিত করেন তিনি তাঁর রাজধানী থেকে অনেকদূরে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি তাদের রাজাদের হাতে ফিরিয়ে দেন। এটি তাঁর দূরদৃষ্টির প্রমাণ। এছাড়া আরও কতকগুলি রাজ্য তাঁর অন্তর্গত ছিল। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণগণ, পশ্চিম ভারতের শকগণ, সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ এবং পূর্বতারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাজারা সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত শুধু প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুশাসক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং গুণীজনের সাহায্যকারী। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর আমলের মুদ্রাগুলি খুব সুন্দর। সমুদ্রগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্ত সুবর্ণযুগের সূচনা হয়। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় এই সুবর্ণ যুগের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।



সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকারি বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পশ্চিম ভারতের শকজাতীয় রাজাদের বিতাড়িত করে মালব ও সৌরাষ্ট্র দখল করেন। এর ফলে পশ্চিম ভারতের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি গুপ্ত

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটে। এঁরা নবরত্ন নামে খ্যাত। এই নটি রত্নের শ্রেষ্ঠ ছিলেন মহাকবি কালিদাস। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশ থেকে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতে আসেন। তাঁর নাম ফা-হিয়েন। তার কাহিনী থেকে গুপ্ত যুগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতন দেখা দেয়। তাঁর বীরপুত্র **স্কন্দগুপ্ত** মধ্য এশিয়ার বর্বর হূণ জাতির আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনিই ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট। তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশ' বছরের মধ্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পরবর্তী রাজারা ছিলেন দুর্বল। রাজপুত্রেরা সিংহাসনের দাবী নিয়ে লড়াই করে রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলতেন। স্কন্দগুপ্তের পর হূণরা আবার গুপ্ত সাম্রাজ আক্রমণ করেছিল। গুপ্তগণ তাদের হটিয়ে দিলেও সাম্রাজ্য খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং গুপ্তবংশের পতন ঘটে।

গুপ্তযুগে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে। এজন্য এযুগকে স্বর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে।

প্রাচীন বাংলার কাহিনী—প্রাচীনকালের বাংলা কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে পুণ্ড্র বা উত্তর বাংলা, বঙ্গ বা দক্ষিণপূর্ব বাংলার নীচের দিক রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ, সুহ্ম বা পশ্চিমবঙ্গ, গৌড় বা উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাংলার উত্তরে ছিল হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূবে ত্রিপুরা, আসাম এবং পশ্চিমে বিহার। বেদগুলিতে বাংলার কোন উল্লেখ নেই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বাংলাকে অপবিত্র স্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এদেশের লোকদের বলা হয়েছে দস্যু। মহাকাব্যের যুগে আর্যদের সঙ্গে বাঙালীদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়।

জৈনধর্মের প্রচারক মহাবীর এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব রাঢ় দেশে এসেছিলেন। রাঢ়ের আধা সভ্য লোকেরা মহাবীরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল। তারা তাঁর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গঙ্গারিডই নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। এটি যুক্ত ছিল

প্রাসিয়য় রাজ্যের সঙ্গে। প্রাসিয়য় গঙ্গারিডই রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা গঙ্গারিডই রাজ্য আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি। এই রাজ্যের পশ্চিম সীমা পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণদিকে এর বিস্তার ছিল গোদাবরী নদী পর্যন্ত। কলিঙ্গ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন নন্দবংশীয় রাজা ধননন্দ এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ও পরিপূর্ণ কোষাগার ছিল। বাংলা মৌর্য ও শুঙ্গ রাজাদের অধীনস্থ হয়। গঙ্গার তীরে গঙ্গে নামে একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। গুপ্ত রাজাদের সময় সমস্ত বাংলা তাঁদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এসময় বাংলায় সুশাসন চালু হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে গৌড়ে এক স্বাধীন রাজবংশের পত্তন হয়েছিল। পরে এই বংশকে উৎখাত করে শশাঙ্ক নামে এক সামন্তপ্রভু স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদেশের একাংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

ভারতের রাজা ও প্রজারা শুধু ভারত নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বহু বিদেশী জাতি ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে পারসীক ও গ্রীকদের ভারত আক্রমণ, মধ্য এশিয়ার নানা বর্বর জাতির ভারতে রাজ্য স্থাপন প্রভৃতির ফলে এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। স্থলপথেও চীন, রোম, ব্যাবিলন, সিংহল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সহিত ভারতের সুসম্পর্ক ছিল।

কুষাণ যুগে ভারতীয়গণ মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে সেখানে ভারতীয়দের বসতি বা উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলে কয়েকটি ভারতীয় রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তুরফান, খোটান, কুচি প্রভৃতি ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র। তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। ভারতীয়রা মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও চালাত।

চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতের বৌদ্ধধর্ম, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি বিস্তার লাভ করে। এসকল দেশে

ভারতীয়রা উপনিবেশ ও শক্তিশালী রাজ্যও গড়ে তুলেছিল। উপনিবেশ স্থাপনের ফলে বাণিজ্যেরওপ্রসার ঘটে। এই সকল দেশে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা থাকায় ভারতে ঐসকল দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শাসক ও প্রজা উভয়েরই অবস্থা সচ্ছল হয়ে ওঠে। বিদেশীদের সঙ্গে যোগা-যোগের ফলে ভারতীয়দের পোশাক, খাদ্য, আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা, সাহিত্য, শিল্প, মুদ্রা ও ধর্ম যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীদের সঙ্গে ভারতীয়দের বিয়ে-থাও হত। এর ফলে সমাজ পরিবর্তিত হতে বাধ্য হয়। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা কমে যায় এবং মানুষের মন উদার হয়ে ওঠে।

প্রাচীন কালে বহু বিদেশী ভ্রমণকারী ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের লেখা বিবরণ থেকে এদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। মেগাস্থেনিস ও ফা-হিয়েন-এর বিবরণ খুবই মূল্যবান। পরবর্তীকালের পর্যটক হুয়েন-সাঙ-এর বিবরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেগাস্থেনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় ভারতে আসেন। ফা-হিয়েন এসেছিলেন গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে।

মেগাস্থেনিসের বিবরণে ভারতীয় সমাজ—মেগাস্থেনিস-এর বিবরণটি হারিয়ে গেছে বহুদিন। শুধু তার কিছু কিছু অংশ এখন পাওয়া যায়। এগুলি থেকেই প্রাচীন ভারতের সমাজ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব। মেগাস্থেনিস বলে গেছেন যে, ভারতবর্ষে সাতটি জাতি ছিল। এগুলি হল—(১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) পশুপালক ও শিকারী, (৪) কারুশিল্পী (৫) সৈন্য, (৬) গুপ্তচর এবং (৭) অমাত্য। স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি বৃত্তি বা পেশাকে জাতি বলে ভুল করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই চারিটি বর্ণের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। তবে এসময় জাতি-ভেদ প্রথা যে খুব কঠোর হয়ে উঠেছিল তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন, এই জাতিগুলির মধ্যে বিয়ে-থা চলত না। কেউ তার পেশাও পাল্টাতে পারত না। সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল খুবই উঁচুতে।

ভাত, মাংস ও তরকারি ভারতীয়দের প্রধান খাদ্য ছিল। পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে খেত না, খাওয়ার সময়ও নির্দিষ্ট ছিল না। পুরুষেরা বহু বিবাহ করত। স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় বিধবা স্ত্রীকে পুড়িয়ে

মারা হত। এর নাম সতীদাহ। মেয়েরা রাজার দেহরক্ষা ও গুপ্তচরের কাজ করত। মেগাস্থেনিস ভারতে দাসদাসী দেখতে পাননি। কিন্তু সে সময় ভারতে বহু দাসদাসী ছিল। তবে তাদের প্রতি বেশ ভাল ব্যবহার করা হত। তারা ছিল সরল, সৎ ও সত্যবাদী। দেশে চুরি-ডাকাতি ছিল না বললেই হয়। রাজ্যে নানা ধর্ম প্রচলিত ছিল। তবে হিন্দুধর্মই ছিল প্রধান।

ফা-হিয়েন-এর বিবরণে সমাজ—ফা-হিয়েন ভারতীয়দের সুখী ও সচ্ছল বলে বর্ণনা করেছেন। তখন জিনিসপত্র ছিল খুবই সস্তা। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। রাজধানী পাটলিপুত্রের ধনীলোকেরা খুবই দানশীল ছিল। উঁচু শ্রেণীর জনগণ নিরামিষ খাদ্য খেত। চণ্ডাল ও নীচু জাতির লোকেরা অবশ্য মদ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি খেতে দ্বিধা করত না। উঁচু শ্রেণীর লোকেরা এজন্য তাদের ছুঁত না। ফা-হিয়েন হিন্দু-ধর্মের প্রাধান্য দেখেছিলেন। তবে বৌদ্ধধর্মেও বহু লোকের বিশ্বাস ছিল।

এতক্ষণ প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হল। এবার প্রাচীন যুগের ভারতে সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা শিল্প-স্থাপত্য ও বিজ্ঞানে কি ধরনের উন্নতি হয়েছিল সে বিষয় দু'চার কথা বলা দরকার।

সাহিত্য—প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়। বেশীর ভাগ বই অবশ্য সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতিগ্রন্থ, কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ প্রভৃতি রচিত হয়।

গুপ্তযুগে সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। এই সময় মহাকবি কালিদাস মেঘদূত, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। কালিদাসের আগে যে সকল কবি-সাহিত্যিক ছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি অশ্বঘোষ ও নাট্যকার ভাস বিখ্যাত। অশ্বঘোষের কাব্য বুদ্ধ চরিত ও ভাসের নাটক স্বপ্নবাসবদত্তার নাম সকলেই জানে। গুপ্তযুগে বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রক, ও বিশাখদত্ত, উপন্যাস লেখক দণ্ডী, গল্প লেখক বিষ্ণুশর্মা, ও গুণাঢ্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৌদ্ধগণ পালি ভাষায় জাতক গ্রন্থ রচনা করেন। জৈনগণও প্রচুর গল্প রচনা করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষায় অনেক কাব্য রচিত হয়। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল,

সংস্কৃত ভাষায় জীবনীগ্রন্থ হিসাবে বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং ইতিহাসগ্রন্থ রূপে কল্হণের রাজতরঙ্গিনী বিখ্যাত। এগুলি অবশ্য পরবর্তীকালের।

শিক্ষা দীক্ষা—প্রাচীন কালে ছাত্রগণ গুরুগৃহে বেদ, স্মৃতি, ব্যাকরণ, ইতিহাস, কাব্য, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ নিত। তক্ষশিলা, বারাণসী, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। এখানে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এখানকার অধ্যাপক হতেন। ভাল ছাত্র না হলে এখানে ভর্তি করা হত না। শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষকগণ সেবা বা বেতনের বিনিময়ে শিক্ষা দিতেন। রাজা-মহারাজারা শিক্ষারব্যয় বহন করতেন। ছাত্র ও শিক্ষকেরসম্পর্কমধুর ছিল।

শিল্প ও স্থাপত্য—প্রাচীন ভারতে শিল্প ও স্থাপত্যের অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল। এসময় কাঠ ও পাথরে নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য করা হত। মৌর্য যুগে চমৎকার সিংহমূর্তি তৈরী করা হয়েছিল। শুঙ্গ যুগের পোড়া মাটির সুন্দর-সুন্দর মূর্তি ও পাথরের তোরণে কারুকার্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কুষাণ যুগে গান্ধার শিল্পরীতিতেও বহু অপূর্ব সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়। গুপ্তযুগে



অজন্তার চিত্র—(১) বানর (২) মাতা ও শিশু

দেশীয় রীতিতে পাথরের বহু মূর্তি তৈরী হয়েছিল। অজন্তা গুহার মনোরম চিত্রগুলি শিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতা প্রমাণ করে। স্থাপত্য বলতে বাড়ীঘর, মন্দির প্রভৃতির নির্মাণ-রীতি বোঝায়। মৌর্য আমলে বিরাট প্রাসাদ, পাথরের

স্তম্ভ, বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ প্রভৃতি তৈরী হত। কণিষ্ক পেশোয়ারে এক বিরাট স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেন। গুপ্তযুগে সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়। দক্ষিণ ভারতেও অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের ধাতু-মুদ্রাগুলিও খুব সুন্দর ছিল।

বিজ্ঞান—প্রাচীন ভারতে গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল। গণিতে এক থেকে নয় সংখ্যা এবং শূন্য ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। জ্যোতির্বিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য। আর্যভটই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সেটি নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরছে। বরাহমিহিরের সূর্য সিদ্ধান্ত ও বৃহৎ সংহিতা জ্যোতির্বিদ্যার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণিও এই বিদ্যার একটি নামকরা পুস্তক। ব্রহ্মগুপ্ত মাধ্যাকর্ষণ-এর নিয়ম সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন। রসায়নশাস্ত্রে দিকপাল ছিলেন নাগার্জুন। ধন্বন্তরী, চরক ও সুশ্রুত বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ছিলেন। প্রাচীন ভারতের শল্য চিকিৎসকগণ কাটা-ছেঁড়া সুন্দর করে জুড়ে দিতে পারতেন। চরক ও সুশ্রুত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে অমূল্য পুস্তক রচনা করে গেছেন। উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট উন্নতি করেছিল।

এতক্ষণ আমরা প্রাচীন যুগের ইতিহাসের নানা দিক আলোচনা করলাম। শীঘ্রই নানা পরিবর্তনের ফলে এই যুগের অবসান ঘটে এবং শুরু হয় মধ্য যুগের।

অনুশীলনী

১। কারা প্রথম লোহার আবিষ্কার করে? লোহার অস্ত্রশস্ত্র কিভাবে তৈরী হত?

২। লোহার ব্যবহার চালু হওয়ার ফলাফল কি?

৩। লৌহ যুগের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

৪। লৌহ যুগের রাজাদের সম্পর্কে কি জান?

৫। ব্যাবিলন কোথায় অবস্থিত? ব্যাবিলনের বাসিন্দাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৬। ব্যাবিলনের পুরোহিতদের বিষয়ে কি জান?

৭। হামুরাবি কে ছিলেন? তিনি কি জন্য বিখ্যাত?

৮। হামুরাবির কোড সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

৯। হামুরাবির কোড থেকে সমাজ সম্পর্কে কি জানা যায়?

১০। মিশর কখন উপনিবেশ স্থাপন করে?

১১। মিশরের পুরোহিতরা কিভাবে শক্তিশালী হন? কোন্ ফ্যারো-র সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে? এই বিরোধের কারণ কি?

১২। পারসীকগণ কোন্ জাতির লোক ছিল? পারসীকরা কোন্ রাজার সময় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল?

১৩। জরথুস্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

১৪। মিশরে ইহুদীদের অবস্থা কেমন ছিল? কেন তাদের উপর অত্যাচার করা হত?

১৫। মোজেস কে ছিলেন? তিনি কি ভাবে ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন?

১৬। ক্রীট কোথায় অবস্থিত? ঈজিয়ান সভ্যতা কাকে বলে?

১৭। ক্রীটের সভ্যতা সম্পর্কে লেখ। এ সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধে কি জান?

১৮। হোমার কে ছিলেন? তিনি কোন্ মহাকাব্য রচনা করেন? হোমার-এর যুগের সমাজ কেমন ছিল?

১৯। এথেন্স ও স্পার্টার জনগণের মধ্যে কি কি পার্থক্য ছিল?

২০। এথেন্স-এর সমাজ-জীবন বর্ণনা কর।

২১। এথেন্সের তুজন নাট্যকার সম্পর্কে যা জান লেখ।

২২। হেরোডোটাস কেন বিখ্যাত? তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

২৩। পেরিক্লিস কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান?

২৪। সক্রেটিস-এর মতবাদ বর্ণনা কর। তাঁকে কেন প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়?

২৫। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। কেন তিনি নন্দরাজ্য আক্রমণ করেন নি?

২৬। আলেকজাণ্ডার কোন্ কোন্ রাজ্য দখল করেছিলেন?

২৭। রোমনগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন? কার্থেজের সঙ্গে রোমের বিবাদের কারণ কি?

২৮। পেট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান কাদের বলা হত ? এদের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

২৯। রোমের ক্রীতদাসগণ কেন বিদ্রোহ করত ? স্পার্টাকাস সম্পর্কে কি জান ?

৩০। জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন ? তিনি কোন্ কোন্ রাজ্য দখল করেন ? কি ভাবে তাঁর মৃত্যু হয় ?

১। রোমের গণতন্ত্রের পতন হয় কেন ?

৩২ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কয়েকটি কারণ আলোচনা কর।

৩৩। শাং যুগে চীনে কোন্ ধাতুর ব্যবহার হত ?

৩৪। কনফুশিয়স কে ছিলেন ? তাঁর মূলকথা কি ছিল ?

৩৫। কে চীনের প্রাচীর তৈরী করেন ? এটি কেন তৈরী করা হয় ? প্রাচীরটি সম্পর্কে কি জান ?

৩৬। চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তাঁর সাম্রাজ্য কেন স্থায়ী হয় নি ?

৩৭। আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কি ? সেটি ক' ভাগে বিভক্ত ?

৩৮। আর্যদের সমাজ কেমন ছিল ?

৩৯। আর্যদের ধর্ম সম্পর্কে লেখ।

৪০। সভা ও সমিতি কি কাজ করত ?

৪১। ভারতের মহাকাব্য কয়টি ও কি কি ?

৪২। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তকদের নাম লেখ। বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে এঁদের কেমন ধারণা ছিল ?

৪৩। বুদ্ধদেবের মতে কি ভাবে দুঃখ জয় করা যায় ?

৪৪। পঞ্চশীল কি ?

৪৫। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে লেখ।

৪৬। অশোককে মহান রাজা বলা হয় কেন ?

৪৭। অশোকের ধর্ম সম্বন্ধে লেখ।

৪৮। কণিষ্কের রাজ্য-সীমা সম্পর্কে কি জান ? তিনি কোন্ ধর্ম গ্রহণ করেন ? এই ধর্ম কোন্ কোন্ দেশে প্রচার করা হয়েছিল ?

৪৯। সমুদ্রগুপ্ত-এর রাজ্য জয় সম্পর্কে লেখ।

৫০। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন্ বিদেশী জাতিকে পরাজিত করেন ? তিনি আর কি নামে পরিচিত ছিলেন ?

৫১। মহাকাব্যের যুগে বাংলা সম্পর্কে কি জানা যায় ?

৫২। গঙ্গারিডই রাজ্য কোথায় ছিল ? এ রাজ্য সম্পর্কে কি জান ?

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বর্ণনা কর।

৫৪। মেগাস্থেনিস-এর বর্ণনা থেকে ভারতের সমাজ সম্বন্ধে কি জানা যায় ? তিনি কি খাঁটি বিবরণ দিতে পেরেছেন ?

৫৫। ফা-হিয়েন চণ্ডালদের সম্পর্কে কি বলে গেছেন ?

৫৬। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কে ? তাঁর দুখানি গ্রন্থের নাম লেখ।

৫৭। রাজতরঙ্গিনী কি ? এটি কার রচনা ?

৫৮। গান্ধার শিল্পরীতি কি ? এই রীতি অনুযায়ী কি তৈরী হত ?

৫৯। অজন্তা কি জন্য বিখ্যাত ?

৬০ তক্ষশিলা ও নালন্দা কেন বিখ্যাত ছিল ?

৬১। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্ত সম্পর্কে কি জান ?

৬২। চরক ও সুশ্রুত কেন বিখ্যাত ?

৬৩। শুদ্ধ উত্তরটি খাতায় লেখ :—

(ক) মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব জানতেন—হোমার / ব্রহ্মগুপ্ত / চরক।

(খ) ইলিয়াড রচনা করেন—কালিদাস / শূদ্রক / হোমার।

(গ) জুলিয়াস সীজার ছিলেন—রোমের সেনাপতি / গুপ্তবংশের সম্রাট / খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক।

৬৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) যীশুখ্রীষ্ট ——ধর্ম প্রচার করেন।

(খ) —— ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

(গ) ফিডিয়াস ছিলেন ——।

৬৫। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) পেরিক্লিস কোন্ দেশের নেতা ছিলেন ?

(খ) হ্যানিবল কোন্ দেশের লোক ?

(গ) চীনের সামন্তপ্রভুদের কোন্ সম্রাট দমন করেন ?

(ঘ) কে চীনের প্রাচীর তৈরী করেছিলেন ?

(ঙ) কোন্ দেশের লোক মহাবীরের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল ?

(চ) জিন কথাটির অর্থ কি ?

(ছ) ফা-হিয়েন কোন্ রাজার শাসনকালে ভারতে আসেন ?

(জ) মেগাস্থেনিস কার দূত ছিলেন ?

(ঝ) চীনে নীতিধর্ম কে স্থাপন করেছিলেন ?

(ঞ) শূন্য কোন্ দেশে আবিষ্কৃত হয় ?

পরিশিষ্ট

কালপঞ্জী

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম থেকে একটি অব্দ গণনা করা হয়। এটির নাম খ্রীষ্টাব্দ। ১৮ খ্রীষ্টাব্দ বললে বুঝতে হবে যীশুর যখন ১৮ বছর বয়স ছিল তখন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বের সময় বোঝাতে খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ কথাটি ব্যবহার করা হয়। যেমন ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এটির অর্থ যীশুর জন্মের ৫০০ বছর আগে। খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতক বলতে বোঝায় খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৯ থেকে ৪০০ পর্যন্ত কিন্তু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক বলতে বোঝায় ৪০০ থেকে ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

খ্রীষ্টপূর্ব	—আন্দাজ ছ'শ' কোটি অব্দ বা বছর	পৃথিবীর জন্ম
	— „ ষাট কোটি „	মানুষের আবির্ভাব
	— „ পাঁচ লক্ষ „	আগুনের প্রথম ব্যবহার
	— „ তিন লক্ষ „	পিকিং মানবের আগুনের ব্যবহার
	— „ পাঁচলক্ষ থেকে আট হাজার „	পুরাতন প্রস্তর যুগ
	— „ আট হাজার অব্দ থেকে শুরু	নব্য প্রস্তর যুগ
	— „ চার হাজার অব্দ	তাম্র-ব্রঞ্জ যুগের শুরু
	— „ চার হাজার অব্দ	মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা
	— „ সাড়ে তিন হাজার অব্দ	মিশরের সভ্যতা
	— „ সাড়ে তিন হাজার „	সিন্ধু সভ্যতা
	— „ আড়াই হাজার „	ক্রীটের সভ্যতার শুরু
	— „ দু' হাজার „	চীনের সভ্যতা
	— „ দু' হাজার „	ব্যাবিলনের হামুরাবি
	— „ ১৭৬০—১১২৫ „	চীনের শাং বংশ
	— „ ১৬০০—১১০০ „	মাইসিনীয় সভ্যতা
	— „ ১৫০০ „	আর্যদের ভারতে আগমন
	— „ দেড় হাজার „	লৌহ যুগ
	— „ দেড় হাজার „	মিশরে সাম্রাজ্য পর্বের শুরু
	— „ ১৩০০ „	মোজেস
	— „ ১২০০—৮০০ „	বেদের রচনাকাল
	— „ ১০০০ অব্দের পর থেকে	গ্রীসে নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব

	— অষ্টম শতক	হোমার
	— আন্দাজ ৬ অব্দ	জরথুস্ত্র
	— „ ৫৬৬—৪৮৬ অব্দ	বুদ্ধদেব
	— „ ৫৫০—৪৮০ „	কনফুশিয়স
	— „ ৫৪০—৪৬৮ „	মহাবীর
	— „ ৫১০	রোমে গণতন্ত্রের শুরু
	— „ ৪৯৪—৩০০ „	পেট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ানদের বিরোধ
	— „ ৪৬৯—৩৯৯ „	সক্রেটিস
	— ৪৬১—৪২৯	পেরিক্লিস
খ্রীষ্টপূর্ব	— „ ৩৩৬—৩২৩ „	আলেকজাণ্ডার
	— „ ৩২৪—১৮৭ „	মৌর্য সাম্রাজ্য
	— „ ৩২৪—৩০০ „	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
	— „ ২৭২—২৩৫,	অশোক
	— „ ২৬৪—২০২ „	রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ
	— „ ২২১—২১২ „	সম্রাট সি-হুয়াং-তি
	— „ ১০০—৪৪ „	জুলিয়াস সীজার
	— „ খ্রী: পূ: ৩১—১৪ খ্রীষ্টাব্দ	অক্টেভিয়াস
খ্রীষ্টপূর্ব	— ৭৮—১০৩	কণিষ্ক
	— আন্দাজ ৩২০—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক	গুপ্তবংশ
	— ৩৩৫—৩৭৬	সমুদ্রগুপ্ত
	— ৪৭৬	পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন

অতিরিক্ত প্রশ্ন

আগে প্রধান প্রধান অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। এখানে আরও কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হল।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

(১) শুদ্ধ করে লেখ :—

(ক) প্যাপিরস তৈরী হয় তামার পাত থেকে।

(খ) প্রত্নতত্ত্ব দর্শনের একটি উপকরণ।

(গ) মোজেস খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক ছিলেন।

(ঘ) জরথুস্ত্র ক্রীটে জন্মগ্রহণ করেন।

(ঙ) কনফুশিয়াস চীনের প্রথম সম্রাট ছিলেন।

(চ) সি-হুয়াং তি-র আইন সংকলন বিখ্যাত।

(ছ) আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা পুরুর ভয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে।

(জ) প্লিবিয়ানগণ অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত।

২। হাঁ বা না লেখ :—

(ক) নব্য প্রস্তরযুগে পাথরের পাত ছাড়িয়ে অস্ত্র তৈরী হত ——

(খ) সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা তেজী ঘোড়ায় করে যুদ্ধ করত ——

(গ) মেসোপটেমিয়ায় খুব ভাল ফসল ফলত ——

(ঘ) আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনে জন্মগ্রহণ করেন ——

(ঙ) নীরো খ্রীষ্টধর্মকে রোমের ধর্ম বলে ঘোষণা করেন।

৩। সময়ানুক্রমে সাজাও :—

(ক) তাম্র-ব্রঞ্জ যুগ, প্রাচীন প্রস্তর যুগ, লৌহযুগ, নব্য প্রস্তরযুগ।

(খ) চীনের সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, মিশরের সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা।

(গ) বুদ্ধদেব, মহাবীর, মোজেস, জরথুস্ত্র, যীশু খ্রীষ্ট।

৪। বাঁদিকের শব্দগুলির সঙ্গে ডানদিকের শব্দের মিল করে পাশাপাশি লেখ :

[উদাহরণ :

	নীলনদ	মেসোপটেমিয়া
	ইউফ্রেটিস	চীন
	হোয়াং-হো	মিশর
উত্তর :	নীলনদ	মিশর
	ইউফ্রেটিস	মেসোপটেমিয়া
	হোয়াং-হো	চীন

জিগ্‌গুরাট	ভারতবর্ষ
পিরামিড	রোম
কলোসিয়াম	চীন
অজন্তা	মেসোপটেমিয়া
চীনের প্রাচীর	মিশর
হোমার	ব্যাবিলন
হামুরাবি	গ্রীস

মৌখিক প্রশ্ন

১। আদিম মানুষের হাতিয়ার কি দিয়ে তৈরী হত ?

২। কোন যুগে চাকা বানান হয় ?

৩। পুরাতন সভ্যতাগুলি কোন্ অঞ্চলে গড়ে ওঠে ?

৪। প্যান-কু কোন্ দেশের লোক ?

৫। ইখনাটন কে ?

৬। অবেস্তায় কি লেখা আছে ?

৭। মোজেস কে ?

৮। গ্রীসের কোন্ নগর-রাষ্ট্র সভ্যতায় সব থেকে উন্নত ছিল ?

৯। পেরিক্লিস কোন্ দেশের নেতা ছিলেন ?

১০। ইতিহাস-এর জনক কে ?

১১ মৌর্য বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

১২। কলিঙ্গদেশ কে দখল করেন ?

১৩। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ?

১৪। গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ?

১৫। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তার নাম কি ?

১৬। শকাব্দ কে প্রচলন করেন ?

১৭। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ কার লেখা ?

৮। শকগণকে কে দমন করেন ?

১৯। কে রামায়ণ রচনা করেন ?

২০ জুলিয়াস সীজার কোন্ দেশের সেনাপতি ছিলেন ?

২১। কাদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজের পতন ঘটে ?

২২। রোমের প্রথম সম্রাট কে ?

২৩। আলেকজাণ্ডারের কোথায় মৃত্যু ঘটে ?

২৪। রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?
